সাহিত্য অঙ্গন

(साहित्य आंगन // Sahitya Angan)
ISSN : 2394 4889
Vol.:V, Issue: X, July-Dec. 2019
Website : www.sahityaangan.com

মুখ্য সম্পাদক
ড. জয়গোপাল মণ্ডল
(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)

ড. জয়গোপাল মণ্ডল
অভিষেক টাওয়ার,
ব্লক-এ, ৪র্থতল, ফ্ল্যাট নং-২
কলাকুশমা, সরাইঢেলা, ধানবাদ-৮২৮১২৭

SAHITYA ANGAN
An Exclusive Interdisciplinary & Literacy Tri-lingual Peer-reviewed Journal
ISSN: 2394 4889
Vol. : V, Issue: X, July-Dec. 2019

Chief Editor :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A,
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828127

© ***Dr. Jaygopal Mandal***

Type Setting
Printing and Binding :
Barnana Prakashani
6/7, Bijaygarh, Kolkata-700 032
Phone : 9874357414

Price : ₹ 50.00

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ পাবলিশিং, ধ্যানবিন্দু ও পাতিরাম, কলেজস্ট্রীট

Published By :
Dr. Jaygopal Mandal
Abhishek Tower, Block-A,
4th Floor, Flat-2, Kalakushma
P.S. Saraidhela, Dhanbad-828109
Phone : 09830633202 / 09570217070
E-mail :joygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com
Website : www. sahityaangan.com

Advisory Board :

Prof. (Dr.) Tapas Basu, (Retd. Prof.) Kalyani University and Guest Faculty of C.U., Kolkata

Dr. Seema Sinha, H.O.D., Department of English & Dean of Humanities, BBMKU, Dhanbad

Prof.(Dr.) Bikash Roy, University of Gour Banga, Malda, W.B.

Prof. (Dr.) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.

Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata

Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam

Dr. K. Bandyopadhyay, R. S. P. College, Jharia, Jharkhand

Dr. Subrata Kumar Pal, Dept. of Bengali, Ranchi University, Jharkhand

Dr. Ira Ghoshal, Dept. of Bengali, T. M. University, Bhagalpur, Bihar

Tapas Roy (Poet), Kasba, Kolkata

Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata

Members from the other Countries :

Dr. Gulam Mustafa (Chittagong University, Bangladesh)

Dr. Sudeepa Dutta (Chittagong Govt. College, Bangladesh)

Md. Masud Mahmud (Dhaka, Bangladesh)

Professor Himadri Sekhar Chakraborty (USA)

Professor Barsanjit Mazumder (USA)

Md. Majid Mahmud, (Writer), Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

Assistant Editor :

Dr. Kutub Uddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College, W.B.

Dr. Samaresh Bhowmik, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata

Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia

Working Editorial Board :

Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata

Jayanta Mistri, Asst. Prof., Dept. of Bengali, Bidhannagar Govt. College, Kolkata

Dr. Sampa Basu, Asst. Prof., Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure

Dr. Soma Bhadra, Dept. of Bengali, Mahadevananda Mahavidyalaya, Barracpur

Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.

Dr. M. K. Pandey, Department of English, BBMKU, Dhanbad

Dr. Indrajit Kumar, Department of English, BBMKU, Dhanbad

Dr. M. K. Singh, Department of English, BBMKU, Dhanbad

Dr. Sovana Ghosh, Dept. of Bengali, Dhrubachand Halder College, Barasat

Dr. Sandip Mondal, Dept. of Bengali, Presidency University, Kolkata

Dr. B. N. Singh, Dept. of Com., B.B.M.K. University, Dhanbad

Dr. R. Pradhan, Dept. of Chem., P. K. R. M. College, Dhanbad

Dr. Sanjay Kumar Singh, Dept. of Hindi, P. K. R. M. College, Dhanbad

Dr. N. K. Singh, Dept. of Hindi, R. S. P. College, Jharia

Dr. D. K. Singh. Dept. of Physics, B.B.M.K. University, Dhanbad

Dr. Mostaq Ahmed, H.O.D. Dept. of Bengali, Presidency University, Kolkata

Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata- 84

সূচি

সম্পাদকীয় / ৭
অমর মিত্র
রমাপদ চৌধুরীর কথা / ৯-১৪
তরুণ মুখোপাধ্যায়
কবিতায় হরিণ ও কবি দিব্যেন্দু পালিত / ১৫-১৮
বিকাশ রায়
রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস : একাকীত্বের মুদ্রা / ১৯-২৭

কবিতা :

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য
সন্ন্যাস / ২৮
অচিন মিত্র
নৌকাডুবি / ২৯
শঙ্কর ঘোষ
কুয়াশার বুকে / ৩০
খেয়া সরকার
রিস্ট ওয়াচ / ৩১
তনুজা চক্রবর্তী
কেন যাব / ৩২
সুস্মেলী দত্ত
ফ্যান্টাসী / ৩৩
সুশীল মণ্ডল
ছুটছি / ৩৪
সৌমিত বসু
শকুন্তলা / ৩৫-৩৬
অলোক দাশগুপ্ত
"না রঙ শব্দ..." / ৩৭
পাপড়ি দাস সরকার
দেখা হলে / ৩৮
অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী
গোপন / ৩৯
সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা
দূরের পাখিরা /বৃষ্টি থেমে এলে / ৪০

প্রবন্ধ :

মনীষা সাহা
রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সংকট / ৪১-৪৯
মহুয়া ভট্টাচার্য্য
রমাপদ চৌধুরী ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনালোক / ৫০-৫৭
পঞ্চানন নস্কর
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: নোঙরহীন উদাস বিষাদ / ৫৮-৬৫
সম্পদ দে
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন মহিমা' পাঠকের দর্পণে / ৬৬-৭২

কবিতা :

রবীন বসু
সংযোগ-সেতু / ৭৩
তাপস রায়
এসো, আমাকে গ্রেপ্তার করো ওগো নির্জন / ৭৪
নির্মল সামন্ত
এসো ছুঁয়ে থাকি / ৭৫
দেবারতি ভট্টাচার্য
স্রোত / ৭৬
মঞ্জুশ্রী সরকার
অন্তহীন আলো / ৭৭
চৌধুরী নাজির হোসেন
সংখ্যা থেকে অসংখ্য / ৭৮
ত্রিদেবেশ চৌধুরী
আমাদের জলতরঙ্গ-স্মৃতি-অজস্র রাগিনীরা শুনিয়েছে-আহির ভৈরবে / ৭৯
রূপ দাস
চালচিত্র / ৮০
পঙ্কজ চক্রবর্ত্তী
পরা অপরায় / ৮১
তথাগত চক্রবর্তী
সাবধান থাকো / ৮২
জয়গোপাল মন্ডল
সত্যের অপলাপ / ৮৩-৮৪
বন্দনা সিনহা মহাপাত্র
বাংলা নাটকের উদ্ভব যুগের কাহিনী ও সংলাপের পরিচয় / ৮৫-৯১
খাদিজা খাতুন
ঔপন্যাসিক বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' : মুসলিম নারী জীবনের এক যন্ত্রণাময় প্রতিচ্ছবি / ৯২-৯৯

কবিতা :

কালিদাস ভদ্র
তোমার পা / ১০০
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়
দীপালি ও নিম্নচাপ / ১০১
তাজিমুর রহমান
সাজঘর / ১০২
নির্মলকরণ-এর দুটি লিমেরিক
জিজ্ঞাসা ও বিজ্ঞাপন / ১০৩
সুলেখা সরকার
সমর্পণ/ ১০৪

সম্পাদকীয়

মাঝে মাঝে সময় প্রতিকূল হয়। ধীরে ধীরে আমাদের যুথবদ্ধতার ফাঁকে স্বার্থান্ধ এক প্রাচীর গড়ে তোলে। সবাই ছুটছে— ভোগের শিখরে পৌঁছতে হবে। পায়ে দ'লে মারছে শিশুকে, কখনো বা শিশুর যৌন প্রাণ বড় সুস্বাদ হয়ে ওঠে। পিতৃত্ব ভুলে বীর্য পৌরুষে মত্ত হয় মানুষ। এমন ঘনান্ধকার দিনে কোথায় আলোর রশ্মিটুকু ঢাকা পড়ে— খুঁজে বেড়ায় শিষ্টজন। অনুকূল সময় খুঁজুতে খুঁজতে বেলা অনেকটা পড়ে গেল। প্রয়োজনের তাগিদে-প্রমোশনের তাড়ায় অনেকে যুক্ত থেকেছেনও এই অঙ্গনে। যখন আমার ঢালাও আয়োজন, তখন অনেকে পাত পেড়ে খেয়ে-পরে এসেছেন আনন্দ লুটে নিতে।

অথচ গতি যখন মন্থর, অঙ্গনে ফুল ফোটাবার জন্য মালির প্রয়োজন, বিজ্ঞাপন দিয়েও বিনা পারিশ্রমিকে কোনও সহৃদয় সুধীজন এগিয়ে আসেনি। যখন যুবতী পশুচিকিৎসক, এক নারীর জীবন পুড়ে ছাই— তখন মোমবাতি যোগান দিলে পথে নামেন অনেক। আধো আলো আধো অন্ধকারে যোগ দেয় কত অপরাধী; নিজেকে মুক্তমনা-উদার সহৃদয় ব্যক্তির পরিচয় ছাপতে ধোয়া-তুলসী পাতা চোখে-মুখে লেপে নেয়।

বেশ দেরি হয়ে গেল এবার। অনটন-টানাটানি, চোরাগোপ্তা শিকারে কীভাবে যে সময় জুলাই থেকে ডিসেম্বর হয়ে গেল— সে কাহিনি না বলাই ভাল। তবুও কিছু কথা-কিছু কবিতা কবি তাপস রায়ের হাতযশে এবং 'বর্ণনার' অকৃপণ লালনে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পেরে আপরাধবোধ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তির শ্বাস ফেলতে পারছি। পাঠকের অতৃপ্তি থাকবেই। সে দোষ স্বীকার করছি। অনুরোধ যারা এ পত্রিকার সুহৃদয়, তাঁরা যদি বাৎসল্যের চোখে একটু তাকান, তাহলে হয়তো বেঁচে যাবে এ পৃথিবী, আগামী—শিশু উত্তরাধিকার।

জয়গোপাল মণ্ডল
৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৩ জানুয়ারি, ১৯৩৮ – ৭ নভেম্বর, ২০১৯

অ ম র মি ত্র

রমাপদ চৌধুরীর কথা

গত ৩০শে জুলাই কথাশিল্পী রমাপদ চৌধুরী ৯৬ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। একবছর হয়ে গেল। ১৯২২-এ তাঁর জন্ম। গত শতকের চল্লিশের দশকে যে লেখকরা লিখতে এসেছিলেন বাংলা সাহিত্যে তাঁদের শেষ প্রতিনিধি ছিলেন রমাপদবাবু। দীর্ঘদিন লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এবং তা ঘোষণা করেই। সেও বছর ২০-২৫ হবে। রমাপদবাবু লিখতেন কম। আমি যখন তাঁকে দেখেছি, সেই ১৯৮৩-৮৪ সাল, বছর ৩৫ আগে, তখনই তিনি সমস্ত বছরে একটি উপন্যাস লেখেন আনন্দবাজার কিংবা দেশ শারদীয়তে। সারা বছর কলম নামিয়েই রাখেন প্রায়। তিনি তখন সম্পাদনা করেন রবিবাসরীয় আনন্দবাজার। তাঁর সম্পাদনায় এই রবিবারের সাহিত্য ক্রোড়পত্রটিতে লেখকরা কে লেখেননি। এবং খুব সতর্ক হয়ে লিখতেন তাঁরা। সম্পাদক রমাপদ চৌধুরী। তখন সেরা গল্পটি রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। এই লেখক লিখেছেন, লেখা ফেরত পেয়েছেন আবার লিখেছেন। আমার জীবনে দেখা সেরা সম্পাদক রমাপদবাবু। কেন না তাঁর কাছে যে পরামর্শ পেয়েছি তা আমাকে সাহায্য করেছে নিজেকে গড়ে তুলতে। তিনি বলতেন, যে ম্যাগাজিন আপনার কাছে আগ্রহ ভরে লেখা চাইবে, দেবেন। দেওয়ার চেষ্টা করবেন। বড় প্রতিষ্ঠান নির্ভর করে থাকা লেখকের পক্ষে ঠিক নয়। বড় প্রতিষ্ঠানে বসেই তিনি এই পরামর্শ দিয়েছেন নবীন লেখককে। বড় উপন্যাস লিখছি, কত শব্দ হবে, ১ লক্ষ ২৫ হাজার কি তার বেশি। শুনলেন চুপ করে। বিষয়টি কী জিজ্ঞেস করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী কী বই সংগ্রহ করেছি? শুনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, পটভূমি চেনেন? উত্তর শুনে চুপ করে থাকলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এত বড় উপন্যাস লিখছেন, কে ধারাবাহিক করবে? জানি না। কারো সঙ্গে কথা হয়নি? উত্তর শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তবু লিখছেন। হ্যাঁ। তিনি বললেন, আপনি ঠিক পথে আছেন। এই ভাবেই লিখতে হয়।

রমাপদবাবু এইভাবে আমাকে সাহিত্যের পথ চিনিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রণাম। তিনি ছিলেন প্রচার বিমুখ মানুষ। তাঁকে কেউ কোনো সাহিত্য সভায় নিয়ে যেতে পারেনি। মঞ্চ পরিহার করেছেন সমস্ত জীবন। টেলিভিশন চ্যানেলেও যাননি। তরুণ লেখকদের সঙ্গে সাহিত্যের আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন।

রমাপদ চৌধুরী না লিখে লেখক। ঠিক এই কথাটাই শুনতাম সেই তিরিশ বছর আগে। তখন তিনি ষাটের কাছে পিঠে। বছরে একটি উপন্যাস। সেই উপন্যাস কখনো খারিজ, কখনো রূপ কখনো অভিমন্যু বা বাড়ি বদলে যায়। তরুণ লেখকদের পছন্দ করতেন। ব্যক্তিগত রমাপদ চৌধুরী থাকুক, তাঁর লেখায় আসি। হ্যাঁ একটি গল্প, একটিই গল্প 'ভারতবর্ষ' তাঁকে চিনিয়ে দিয়েছিল তাঁর আরম্ভের দিনে, সেই সত্তর বছর আগে। খড়গপুর রেল কলোনিতে বড় হওয়া রমাপদ চৌধুরীর কাছে শুনেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কথা, এই কলকাতা শহর, সেই রেল কলোনি, মার্কিন সোলজার, নিষ্প্রদীপ রাত্রির কথা। 'ভারতবর্ষ' গল্পটি একটি অখ্যাত হল্ট স্টেশন আন্ডা হল্টের কথা। সেইখানে মার্কিন সোলজারে ভর্তি ট্রেন এসে দাঁড়াত। তারা প্রাতরাশের জন্য নামত গাড়ি থেকে। আন্ডা দিয়ে ব্রেক ফাস্ট তাই আন্ডা হল্ট। কাঁটা তারের ওপারে ভারতবর্ষ। মাহাতোদের গ্রাম। তাদের খেত-খামার। ঋজু মেরুদন্ডের মাহাতো পুরুষ-রমণীরা চাষবাস আর ফসল নিয়ে বেঁচে থাকত। এইভাবে বেঁচে থাকা মানুষগুলিকে ভিখিরি করে দেওয়ার গল্প 'ভারতবর্ষ'। অনুদান, সাহায্য যে কীভাবে একটি জনজাতি একটি দেশের মেরুদন্ডকে বাঁকিয়ে দেয়, ভিখিরি করে দেয়, সেই গল্পই 'ভারতবর্ষ'। সেই গল্পই বহুদিন ধরে টিকে থাকে যে গল্প সময় থেকে সময়ান্তরে গিয়েও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পটি তেমন। এই গল্পের নানা মাত্রা। দেশটা সেই যে আন্ডা হল্টের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল হাত বাড়িয়ে, সেই হাত তো নামেনি এখনো। নামবে না কখনো। উচ্ছিষ্টের লোভে মানুষ তো হাত বাড়িয়েই আছে। ভারতবর্ষ শুধু এই ভারতবর্ষের গল্প নয়, এই গল্প গোটা তৃতীয় বিশ্বের হয়ে গেছে। আমি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত গল্প 'পোস্ট মরটেমের' কথা বলছি। এই গল্প একটি আত্মহত্যার। সতীশবাবু নিপাট এক মধ্যবিত্ত মানুষ, সকালে শুনলেন প্রতিবেশী ধনঞ্জয়বাবু আত্মহত্যা করেছেন। যে মানুষটির সঙ্গে গতকালও দেখা হয়েছে, দুদিন আগে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন অনেকসময় ধরে, সেই মানুষটি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। আর এক প্রতিবেশী ব্যানারজিবাবুকে ডেকে সতীশবাবু বেরোলেন। ধনঞ্জয়বাবুর লাল বাড়িটির সামনে স্বাভাবিক জটলা। আশপাশের কৌতুহলী মানুষজন, নানা প্রতিবেশী জড়ো হয়েছেন, লোকটি কেন আত্মহত্যা করল তা খুঁজে বের করতেই যেন তাঁর বাড়ির সামনে জটলা করা। একে অন্যকে নিজের অনুমানের কথা বলছে, মন্তব্যের উপর মন্তব্য নিয়েই এই গল্প। গল্প নয় মধ্যবিত্তের ভিতরের চেহারাটা একটু একটু করে উন্মোচন করা। একটি কঠিন মৃত্যুকে ঘিরে নানা রসের সন্ধান। রমাপদ চৌধুরীর গল্পে উপন্যাসে, মানুষের ভিতরের হাড় কঙ্কাল বেরিয়ে আসে। সত্য উন্মোচনে তিনি অতি নির্মম। 'ভারতবর্ষ' গল্পে যে মাহাতো বুড়ো প্রত্যাখ্যান করতে করতে মাথা উঁচু রেখেছিল, সেই বুড়োই শেষ পর্যন্ত, বকশিস

বকশিস বলে চিৎকার করে ওঠে। যে মাহাতো বুড়োকে নিয়ে ভারতবর্ষ তার মাথা উঁচু করে রেখেছিল, সেই মাহাতো বুড়োই গোটা দেশটাকে ভিখিরি বানিয়ে দেয়। 'পোস্ট মরটেম' গল্পে গলায় দড়ি দিয়ে মরা ধনঞ্জয়বাবুর বাড়ির সামনে যাঁরা সক্কালে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা নিরাপত্তার বৃত্তে থাকা মধ্যবয়স্ক পুরুষ, একটু করে খোলস ছেড়ে বেরোচ্ছে। তাদের ভিতরে এই মৃত্যুর কারণ খোঁজায় কাজ করছে এক ধরণের তৃপ্তি। তাঁরা বেঁচে আছেন, একটি লোক আত্মহত্যা করেছে, আত্মহত্যা আসলে লুনামি ছাড়া কিছু নয়, ব্যানারজির কথায় সতীশবাবু না করেন। আসলে কার যে কী হয়, কোথায় লাগে কেউ জানে না। এঁদের কথা শুনতে শুনতে একটি যুবক বলে ওঠে, আসলে কারোর তো এই অভিজ্ঞতা নেই। সেই কথায় দুজনে চমকে ওঠেন। সরে যান যুবকটির কাছ থেকে। ব্যানারজি গিয়ে দাঁড়ান উচ্চপদের চাকুরে সুমন্তবাবুর সামনে। তিনি চুরুট হাতে এসে দাঁড়িয়েছেন খোঁজ নিতে। তাঁকে ঠিক পছন্দ করেন না সতীশ। অহঙ্কারী মনে হয় মানুষটিকে। সতীশ করেন সামান্য চাকরি। নিজেকে গুটিয়ে রাখেন। সুমন্ত জিজ্ঞেস করেন, কী হতে পারে, ক্যান ইউ গেস? ব্যানারজি বলেন, মনে হয় তো সুখী পরিবার। শুনে বাধো বাধো গলায় সতীশ বলেন, ওসব কিছু নয়, ওর বাড়িতে তিনি গেছেন, গতকালও ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। ব্যানারজি শুনতে শুনতে বলেন, নো ওয়ান ইজ হ্যাপি, তাই বলে কি সবাই সুইসাইড করে বসবে? তখন সেই যুবকটি বলে, 'কে কতখানি আন-হ্যাপি তার থারমোমিটার তো আমাদের হাতে নেই।' যুবকটি পিছু পিছু ঘুরছে যেন, তাঁদের কথা শুনছে। গল্পটি এই রকম। প্রতিবেশীরা নানা ভাবে আত্মহত্যার কারণ খুঁজে বের করতে গিয়ে যেন যুবকটির ব্যঙ্গের মুখে পড়ে বারবার। যুবকটি যেন তাদের প্রতিপক্ষ। তাঁরা তাকে এড়াতে সরে যান। খুঁজতে থাকেন আত্মহত্যার কারণ। তাঁদের কৌতুহল অপরিসীম। কোনো চিঠি লিখে রেখে গেছেন কি ধনঞ্জয়বাবু? একজন বলেন, তেমন কান্নাকাটি তো শোনা যাচ্ছে না। সতীশ এই কথায় ক্ষুব্ধ হন। একজন কেউ বলেন, 'এখন ওদের কতরকম ভয়, কতরকম ঝামেলা, এখন ওঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য বউটাকে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে হবে। নুইসেন্স। 'কথা শেষ করে তিনি আবার বলেন, 'ধনঞ্জয়বাবুর বউ তো কান্নাকাটির পার্টি নয়, স্লিভলেস ব্লাউজ পরে। এই রকম কথায় কথায় গল্প এগোয়। আসলে মৃতের নয়, জীবিতের হাড়-কঙ্কালের ছবি দেখাতে থাকেন লেখক। গল্প কাহিনি নির্ভর নয়। এই গল্পে একটিই ঘটনা ঘটে, তা হলো ধনঞ্জয়বাবুর আত্মহত্যা। আর কিছুই নয়। বাকিটা হৃদয়হীন প্রতিবেশীর নিষ্ঠুরতা। নিষ্ঠুরতা তাদের কৌতুহল আর মন্তব্যে ক্রমশ ফুটে উঠতে থাকে। আরো হৃদয়হীনতার দিকে এগোয়। শুধু একবার ওবাড়ির কাজের মেয়েটি বেরিয়ে তার বাচ্চাটিকে সেই জটলার মধ্যে দেখে পিঠে চাপড় দিয়ে চিৎকার করে ওঠে, কেন এয়েছিস, যা ঘরে যা, বাবুদের

মতো হুজুগ দেখতে এসেছেন....., এবার বলি তাঁর সেই তীব্র, অন্তর্ভেদী উপন্যাস 'খারিজ'-এর কথা।

আমি ১৯৭৪-৭৫ সালে 'খারিজ' পড়ি। তখন দুটি উপন্যাস এপারের বাঙালি পাঠক সমাজকে স্তম্ভিত করেছিল। ১৯৭২ সালে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশীর মা' এবং ১৯৭৫-এ রমাপদ চৌধুরীর 'খারিজ'। 'খারিজ' একটি বালকের মৃত্যুর কাহিনি। বালকের অসহায় মৃত্যু এবং মধ্যবিত্ত শহরবাসীর আত্ম উন্মোচনের এক ভয়ঙ্কর কাহিনি 'খারিজ'। এই উপন্যাসের পরতে পরতে মধ্যবিত্ত নাগরিক মানুষের জীবনের নিরুপায় এক পরিস্থিতি, এবং তা থেকে মুক্ত হতে নানা শঠচারিতার আখ্যান বুনেছেন লেখক। কেমন ছিল সেই আচমকা নেমে আসা এক ভয়ানক পরিস্থিতি। অদিতি জয়দীপের ছিল শান্ত এক সংসার। নিস্তরঙ্গ জীবন। তাদের বিবাহ ছিল প্রেমের। অদিতির বাসনা ছিল একটি হাতে ধরা কাজের লোক। সর্বক্ষণ থাকবে তাদের সংসারে। এসেছিল এক বালক। পালান। তার বর্ণনা দিয়েছেন রমাপদবাবু এই ভাবে, 'রোগা রোগা চেহারা, লাজুক লাজুক মুখ। অজ পাড়া গাঁ থেকে এসেছে, চোখে তখনো দাম-শ্যাওলার আভা, মুখে নিকোনো উঠনের ঠান্ডা প্রলেপ।' বছর বারোর বালক। বাবা খেতে দিতে পারে না তাই লোকের বাড়ি কাজে দেওয়া। সেই বালকই শীতের রাতে বন্ধ রান্না ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। সকালে দোর খোলে না। দরজা ভেঙে দেখা গেল মরে পড়ে আছে। কী ভয়ানক এক মৃত্যু। জয়দীপ আতঙ্কিত হয়। এরপরে কী হতে পারে? দরজা ভাঙার পর জয়দীপের মনে হয়েছিল পালান বেঁচে আছে। সে ডাক্তার আনতে ছোটে। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ডাকে। আসলে তখন সে মরে গেছে। কিন্তু পালানের বেঁচে থাকা জয়দীপের অস্তিত্ব রক্ষার সমার্থক হয়ে গেছে তখন। মৃতদেহ পুলিশ নিয়ে যায়। পোস্ট মরটেম হবে। জয়দীপের আত্মরক্ষার প্রয়াস আরম্ভ হলো। মৃত্যুর জন্য কি সে সরাসরি দায়ী? সে ভাড়াটে। বাড়িওয়ালা ওই ঘরে কোনো ভেন্টিলেটর রাখেনি। ভেন্টিলেটর থাকলে কি মরত পালান দম আটকে? তাদের আর একটি ঘর আছে। সেই ঘরে আলমারি আছে আর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিশ আছে। সেখানে পালানকে শুতে দেয়নি অদিতি। কেন দেয়নি? আগে একজন ভৃত্য ছিল বিশ্বনাথ, সে চুরি করে পালিয়েছিল। অবিশ্বাস পালানকে ঠেলে দিয়েছিল ওই রান্না ঘরে। আসলে পরতে পরতে রমাপদবাবু পরিবারটিকে কাঁটা ছেঁড়া করেছেন। এই কাঁটা ছেঁড়াতেই তিনি স্বচ্ছন্দ। সুযোগ সন্ধানী মধ্যবিত্তের অন্তরাত্মা তিনি যেন দেখতে পেতেন। অনেক উপন্যাসেই কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত জীবনের কথা আছে। তাদের নানা বদলের কথা আছে। আশ্রয়ের জন্য যে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যায়, সেই কথা আছে 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসে। অভিমন্যু উপন্যাসে এক ডাক্তারের অসম্ভব এক মৃত্যুর কথা আছে রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। অথচ মৃত্যুর কোনো কারণই ছিল না।

তিনি নিমগ্ন গবেষক। তাঁর গবেষণা ক্ষমতার কোনো বিন্দুতেই সরাসরি আঘাত করছে না বলেই মনে হয়। কিন্তু রমাপদবাবু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে চলে যান। আসলে ক্ষমতা সকলকে তার পায়ের কাছে দেখতে চায়। গত ৪০-৪৫ বছরে বাঙালি মধ্যবিত্তের বদল ধরা পড়েছে তাঁর লেখায়। 'খারিজ' উপন্যাসে এক জায়গায় আইনজীবী বলছে, 'আন ন্যাচারাল ডেথ, এক্সোয়ারি হবে না? একটা মানুষের মৃত্যু, আমাদের দেশে একটা মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব তার, বুঝলে?'

সব দিক থেকে নিজেকে সুরক্ষিত করে তুলতে চেষ্টা করছিল জয়দীপ। উকিল, পোস্ট মরটেম রিপোর্ট ম্যানেজ, থানা পুলিশ.....। জয়দীপের বন্ধু রাধানাথ জয়দীপকে এক জায়গায় বলছে, 'ঐ বাচ্চা ছেলেটা, পালান না কী নাম, ও মরে গিয়ে এখন একা লড়ছে। আর আমরা সবাই একদিকে, কারণ আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, পরস্পরকে চিনি, যেমন করে পারি খুঁজে বের করি। ডাক্তার, উকিল, ইনফ্লুয়েন্স সব তো আমাদের দিকে।

শেষ অবধি করোনারের কোর্টে এই মামলা খারিজ হয়ে যায়। ঘুমের ভিতর পালান মারা গিয়েছিল কার্বন মনোক্সাইড বিষ ক্রিয়ায়। প্রবল শীত পড়েছিল। তার গায়ে দেওয়ার মতো লেপ কম্বল ছিল না। তেলচিটে খুব পাতলা একটা তোষক আর গায়ের চাদর। ঘরটিকে গরম করবার জন্য সে কাঠ কয়লা দিয়েছিল নিভন্ত উনুনে। এতে কার দোষ থাকতে পারে? জয়দীপ, অদিতির? বাড়ির মালিক রায়বাবুর কিংবা সেই বিশ্বনাথ নামের ছেলেটির যে চুরি করে পালিয়েছিল। চুরি করেছিল বলেই না সেই ঘরটি আর পেল না পালান। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। বিশ্বনাথ চুরি করে পালাল কেন, পালানকে ওর বাবা কাজে দিল কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। 'খারিজ' উপন্যাস এক আয়না। তার ভিতরে নিজেদের মুখ দেখে লুকোতে ইচ্ছে করে। আসলে বার্তাহীন কাহিনি আর ঘটনাপুঞ্জের বিবরণের বাইরে এই উপন্যাস আমাদের টলিয়ে দিয়েছিল। আমাদের এমনিই টলিয়ে দিয়েছিল তাঁর অনেক ছোটগল্প। উপন্যাসে অনেক বছর কলকাতা শহরে বিচরণ করলেও রমাপদ চৌধুরী তাঁর আরম্ভের দিনে গোটা ভারতই পরিক্রমা করেছেন যেন। 'ভারতবর্ষ' নিয়ে কথা বলেছি, ভারতবর্ষ গল্পটির কথা জানেন সকলে। কিন্তু উদয়াস্ত, রেবেকা সোরেনের কবর, বিবি ক'রজ, দরবারী, তিতিরকান্নার মাঠ, তালাক...কত গল্প দিয়ে তিনি স্বাধীনতার আগের যে দেশটিকে ধরতে চেয়েছেন, তার কথা বিশেষ শুনি না। কয়লা খাদান, রেলকলোনি, রেল স্টেশনের মাস্টারবাবু, খাদানের সায়েব সুপারভাইজর, আদিবাসী সমাজ তিনি যে এত চিনতেন, এত গভীর ভাবে চিনতেন তা প্রায় অনুল্লেখিত হয়ে রয়েছে। দরবারী গল্পে উত্তর বিহারের সামান্য এক রেল ষ্টেশন, আদিবাসী অধ্যুষিত জনপদ লাপরা কী ভাবে হয়ে ওঠে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বসতি ম্যাক্লাস্কিগঞ্জ, সেই কাহিনি লিখেছেন তিনি।

'দরবারী' পড়ার মুগ্ধতা এখনো যায়নি। সেই প্রকৃতি আর সময় রমাপদবাবুর কলমে যেন গোপাল ঘোষের নিসর্গ চিত্র। বিপুলতা ছিল সেই সময়ের সব গল্পেই। পটভূমি আলাদা ছিল। মানুষজন আলাদা ছিল। তিনি তাঁর কলমের আঁচড়ে সেই পুরাতন ভারতটিকে এঁকেছিলেন যেভাবে তা কিছুটা সুবোধ ঘোষে পাই। 'দরবারী' গল্পের জোনাথন ম্যাক্লাস্কি, 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পে আদিবাসী কন্যা রূপমতীর রেবেকা সোরেন হয়ে যাওয়া, 'উদয়াস্ত' গল্পের প্রবীণ ষ্টেশন মাস্টার বিষ্ণুরাম, 'তিতির কান্নার মাঠ' গল্পের অরুণিমা সান্যাল, 'তালাক' গল্পের চাঁদবানু, এবং 'কাসেম' বা 'ভারতবর্ষ' গল্পের মাহাতোবুড়ো, আমাদের সাহিত্যে অনন্তকাল বেঁচে থাকবে। রেবেকা সোরেনের কবর, বিবি ক'রজ, তালাক ও 'ভারতবর্ষ'র মতো গল্প যে কোনো ভাষার সম্পদ। তাঁর সব গল্পেই ভারতবর্ষ। সেই গল্প মাহাতো বুড়োর গ্রামের মতো ভিখিরি হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষ যেমন, নিরুপায় মানুষের ভারতবর্ষ বৈচিত্রের ভারতবর্ষ। এখনো রমাপদ চৌধুরীর গল্প পড়ার পর চুপ করে বসে থাকতে হয়। রমাপদবাবু প্রথম জীবনে 'লালবাঈ', দ্বীপের নাম টিয়ারং এবং 'বনপলাশীর পদাবলী' লিখে সুখ্যাত হয়েছিলেন। চলচ্চিত্রকাররা তাঁর কাহিনি নিয়ে ছবি করেছেন অনেক। তপন সিংহ, মৃণাল সেন, ইন্দর সেন প্রমুখ তাঁর কাহিনি ছবিতে এনেছেন। কিন্তু তাঁর আরম্ভের গল্পগুলিকে, যে গল্প আমাদের এখনো বিব্রত করে, তা আমি ভুলতে পারি না। রমাপদবাবু সেই পৃথিবী ছেড়ে এসেছিলেন। আমরা যেন বঞ্চিত হয়েছি সেই ছেড়ে আসায়। পরে চমৎকার সব শারদীয় উপন্যাস লিখেছেন। আমি অপেক্ষা করে থাকতাম সেই উপন্যাসের জন্য, কিন্তু তা কখনোই সেই ভারতবর্ষ, যা আছে দরবারী, তালাক, রেবেকা সোরেনের কবর ইত্যাদি গল্পে, হয়ে ওঠেনি। তাঁকে আমার বিনম্র প্রণাম। যা পেয়েছি তা কম কিসের?

তাঁকে বহুদিন মনে রাখবে বাঙালি পাঠক। বহুদিন।

ত রু ণ মু খো পা ধ্যা য়

কবিতায় হরিণ ও কবি দিব্যেন্দু পালিত

বাংলা কবিতায় হরিণের অনুপ্রবেশ সম্ভবত প্রথম দেখি চর্যাপদে। ভুসুকুপাদের লেখা চর্যাগানে (৬ সংখ্যক) পড়ি,

তিন ন ছুপই হরিণা পিবই না পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলঅ ন জানী।।

এর সঙ্গে আছে ট্র্যাজিক পরিণতির পূর্বাভাস—'অপণা মাংসে হরিণা বৈরি'। আদি গীতিকবিতায় হরিণ/ হরিণী বিপন্ন প্রাণী। তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা যা-ই-থাক, এখানে তা বিবেচ্য নয়। বৈষ্ণব-কবিরা রাধার অসহায়তা বোঝাতে (দ্র. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য) হরিণ প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু হরিণ যে প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক একথা সর্বপ্রথম বলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর একাধিক গানে হরিণ, সোনার হরিণ প্রসঙ্গ আছে। যে হরিণ বনের নয় মনের এবং 'গতি রাগের সে ছিল গান'। মনোহরণ চপল চরণ সোনার হরিণের জন্য তার আকুলতা মর্ম ছুঁয়ে যায়।

রবীন্দ্র পরবর্তী কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই সবেচেয়ে বেশি হরিণ চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন, তাঁর 'শিকার', 'ক্যাম্পে' 'হরিণেরা' কবিতাগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। যেখানে এই ঘাতক সমাজে সৌন্দর্যের প্রতীক হরিণ নিহত হয়। খাদ্য হয়। প্রতি মুহূর্তে বাঘ ও মানুষের লোভের গ্রাসে পড়ে।

কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার,
বনের ভিতরে আজ শিকারীরা আসিয়াছে,
(ক্যাম্পে)

এবং তাঁর মর্মান্তিক উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা
বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।

'শিকার' কবিতায় সেই একই হননদৃশ্য—'উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এলো'। চিরন্তন জৈব ঈর্ষায় ও লোভে 'বাঘ হরিণের পিছু আজও ধায়' (১৯৪৬-৪৭) তবে 'হরিণেরা' কবিতায়, সুররিয়ালিস্টিক ভাবনা থাকায় হরিণেরা সৌন্দর্য প্রতিমা,

রোমান্টিক স্বপ্ন হয়ে উঠেছে।— 'হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে'। কখনোবা 'হীরার আলোকে'। যে আলোয় 'হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে।'

তিরিশের দশকের আরেক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর কাব্যের নামই দেন 'হরিণ চিতা চিল'। যেখানে মানুষের লোভ থেকে বাঁচতে বলেন,

হরিণ, আমার হরিণ,
তোমার জন্যে জাদুঘর দেবো বানিয়ে।

প্রত্নসামগ্রী হবে বনের এই সুন্দর প্রাণী বাংলাদেশের পঞ্চাশের খ্যাতনামা কবি শামসুর রাহমানও তাঁর কাব্যের নাম দেন "হরিণের হাড়"। যে-কবিতায় আছে হরিণের অকাল মৃত্যু বা হত্যা যা দেখে তাঁর মনে জেগে ওঠে সৃজনেচ্ছা।

পঞ্চাশের বিশিষ্ট মহিলা-কবি কবিতা সিংহের একটি কবিতা ও কাব্যের নাম "হরিণা বৈরী"। যেখানে নারীজন্মের ব্যর্থতা, অসহায়তা, অপমান বড়ো করে দেখান। পুরুষের কামনার আগুনে নিরুপায় হয়েই বলেন,

আগুনে আহুতি হোক
চোখ নাক স্তন ত্বক মাংসের ঋণ
বৈরী আপনা মাসে হরিণা অচিন।

বাংলা কবিতার এই হরিণ চর্চায় আমরা দিব্যেন্দু পালিতের নাম যুক্ত করতে পারি। সুখ্যাত যিনি কথাসাহিত্যিক রূপেই পরিচিত। কিন্তু কবিতা তাঁর মর্মে। শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় বলেছেন—

'...কবিতার ভিতর মহলে প্রায় তিরিশ বছর ঘোরাফেরা করে বুঝেছি, শব্দের পর শব্দের নির্মাণে ক্ষরণ যতটা ধরা পড়ে, ক্ষত ঠিক ততোটা নয়।...'

দিব্যেন্দু পালিত (১৯৩৯-২০১৯) তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্র। পরে বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করেন। তারপর যোগ দেন আনন্দবাজার পত্রিকায়। পেয়েছেন বহু সম্মান ও পুরস্কার—আনন্দ, ভুয়ালকা, বঙ্কিম, সাহিত্য অকাদেমি। ব্যক্তি জীবনে সুখী গৃহস্থ। মিতবাক, সজ্জন। তাঁর লেখা গল্পগুলি খুবই উজ্জ্বল। উপন্যাসে নাগরিক জীবনের নানা দিক উদ্ভাসিত। আর তাঁর কবিতায় উন্মোচিত হয়েছে তাঁর অন্তর্লোক। প্রেম, প্রকৃতি, যৌনতা, সমাজ, কোন কিছুই সাড়ম্বরে সোচ্চারে বলেন না। মগ্ন পাঠক বুঝে নেন অভিঘাতটুকু। তাঁর লেখার ও বাচনভঙ্গির কিছু নমুনা দিই।

১। পোখরান বিষয়ে কিছু শব্দ লেখো যত দ্রুত পারো,
ইস্যুটা গরম থাকতে হোক তার ব্যাপ্ত বিপণন;
বিষয় বিবেক— যারা বিবেকী তারাই এটা খাবে।

(কালো বৃষ্টি)

২। যখন অভীক খুঁজতে বাধ্য হবে অমরের সার্ট
শ্যামলীর শাড়ির তলায় খচখচ করবে তপতীর সায়া
(মানুষ যে ভাবে কথা বলে)

৩। ভালোবাসা ঘরের দেয়ালে
স্বস্তিক চিহ্নের মতো ঘোরে
(ভালোবাসা ঘরের দেয়ালে)

৪। আধবুড়ো বাবুটি ভাবে— মেম সাহেবের ওই
কচি, রাঙা আর শক্ত
অথচ মিষ্টি, নরম আপেল দুটো যদি পেতাম!
(তিন রকম ইচ্ছে)

৫। রোদ্দুরই সব, রোদ্দুরই সব, রোদ্দুরই বৈভব
(ভ্রমণ)

দিব্যেন্দু পালিতের কবি সত্তার নানা পরিচয় বিস্তৃত আলোচনার দাবি রাখে। আপাতত তাঁর কবিতায় 'হরিণ' কীভাবে ঐতিহ্যের পরম্পরা ধারণ করেছে তা-ই দেখাতে চাই। পূর্বসূরিদের মান্য করেই তিনি কবিতায় এই বিশেষ প্রাণীকে উপস্থাপনা করেছেন।

'হরিণের গায়ে খুব জোর ছিল, হরিণ ছিল না।
সে ছিল বাঘের, চোখে, উদয়াস্ত ভূমিকা ছাড়াই
গম্ভীর উদর তার ভরে যেতো মাংস আর মেদে।'
(হাই)

বোঝাই যায়, এখানে ভক্ষ্য ও ভক্ষকের চিরায়ত সম্পর্ককে কবি তুলে ধরেছেন। যার মূল কথা: 'যেসব হৃদয়ে খুব প্রেম ছিল, প্রেমিক ছিল না'।

তাঁর একটি কাব্যের ও কবিতার নাম "অমৃত হরিণ"। কবিতাটি শুরু হয়েছে এইভাবে—

'মৃত হরিণীর পাশে শুয়ে আছে অমৃত হরিণ
শুয়ে শুয়ে কী ভাবছে এই নিয়ে শুরু হয় খেলা
প্রণয় বিদ্ধ হলে সেও বধ্য হবেই এ কথা
হরিণ যতটা জানে তারও বেশি জানে শিকারীরা।'

জীবনানন্দীয় আমেজ নিশ্চয় আছে। চর্যাপদের উত্তরাধিকারও। তবু মৃত্যু নয়, প্রেম—যা কবিতার মতো শাশ্বত—তাকেই অমরত্ব দিতে চান কবি।

'এভাবে আমরাও চলে যাবো ওই হরিণের কাছে
শুধুই অশ্রু নিয়ে কেননা অনেক হাত বন্দুক চিনেছে
যে-ভাষা অবোধ্য তাকে ছিঁড়ে পেতে গবেষণা দিতে—

তখনও কবিতা ছিল মৃত্যুর পরেও থেকে যাবে।'

অর্থাৎ মর পৃথিবীতে 'সোনার স্বপ্নের সাধ' কবে আর ঝরে? তাঁর 'অপেক্ষা' কবিতার প্রথম দু'পংক্তি উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।—

'অন্যমনে একদিন ভালোবাসা কড়া নেড়ে যাবে;
অপেক্ষায় থেকো।'

বি কা শ রা য়

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস : একাকীত্বের মুদ্রা

কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর জন্ম ১৯২২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছে খড়্গপুর রেল শহরে। ইংরেজি সাহিত্যের স্নাতকোত্তর। এম.এ পাশ করার পর বীমা কোম্পানীর সংগঠক থেকে ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির সরবরাহের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। পত্রিকা প্রকাশ করেছেন দু'টি 'ইদানীং' ও 'রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা'। তাঁর চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'দরবারী' (১৩৬১) থেকেই সাহিত্যিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ছোটগল্পের মাধ্যমে। রমাপদ চৌধুরীর সর্বাধিক আকর্ষণের ক্ষেত্রও ছোটগল্প।

রমাপদ চৌধুরীর সৃজন বিশ্বের ভরকেন্দ্র মধ্যবিত্ত মানুষ ও তার আচার আচরণ, মুখ ও মুখোষ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, জটিল ও কুটিল ক্রিয়াকলাপ, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সম্পর্কের ভাঙন, আত্মকেন্দ্রিকতার ঝোঁক। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'প্রহর' এর জন্ম ছোটগল্পের ভাবনা বলয় থেকে। বাংলা কথাসাহিত্য যখন বেশ কিছু শক্তিশালী নক্ষত্র সমাবেশে ভরপুর তখন সাহিত্য অঙ্গণে পদার্পণে করলেন রামাপদ চৌধুরী। জ্বল জ্বল করছেন তারাশঙ্কর ও সুবোধ ঘোষ। এই দু'জনের প্রভাবকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া যে কঠিন সেকথা কবুল করেছেন রমাপদ চৌধুরী স্বয়ং—

"...এঁদের দু'জনের প্রভাব কাটিয়ে নিজস্ব একটা পথ খুঁজে বেরকরা খবু সহজ ছিল না।' (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, ১৯৯৩) যদিও সময় লেগেছে রমাপদ চৌধুরীর, তবু নিজস্ব একটা পথ আবিস্কারে সক্ষম হয়েছিলেন, সেটি তাঁর লিখন বিশ্বের ক্রম বিবর্তনের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রমাপদ চৌধুরী 'সাহিত্য অকাদেমি' (১৯৮৮) পুরস্কারে ভুষিত হয়েছিলেন 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসের জন্য।

১৯৭১-এ 'এখনই' উপন্যাসের জন্য পেয়েছিলেন 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'আনন্দ পুরস্কার' সহ পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'।

'খারিজ', 'লালবাঈ', 'বীজ'-এর মতো অসাধারণ উপন্যাস লেখার পরও যিনি বলেন আমার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এখনো লেখা হয়নি।' তাহলে বোঝা যায় লেখকের ভালো আরো ভালো লেখার খিদে জাগরুক ছিল মনোভূমিতে। সৃষ্টিসুখের এই অনন্ত

পথ পরিক্রমায় অসংখ্য ছোটগল্প, চল্লিশের অধিক উপন্যাসের কথাকার রমাপদ চৌধুরীই পারেন এরকম বয়ান উপস্থাপনা করতে—

'...বিষয় বদলে গেলে কখনো কখনো ভাষাও বদলে দিতে হয়, হয়তো সেই জন্যই একটা বই থেকে আরেকটা বইয়ের স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। শুরু থেকে শেষ যা কিছু লিখবো, সব মিলিয়ে আমার একটাই উপন্যাস [গ্রন্থনা-শান্তনু দাস, জটায়ু ২-য় সংখ্যা]

সবমিলিয়ে এই 'একটাই উপন্যাস' লেখার উৎস, প্রেক্ষিত ও প্রশ্চাদপটটি জেনে নেওয়া যাক রমাপদ চৌধুরীর অকপট স্বীকারোক্তিতে—

"....আমার কাছে মানুষের মানবিকতার লাঞ্ছনাটিই চিরদিন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একটা নিরুপায় মানুষ, তার সম্মান, সংসার তার অস্তিত্বের গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তাহীনতার বিপন্নবোধ—মান অপমানের টানাপোড়েন এসবই আমাকে ভাবাত সব সময়। খড়্গপুরের মতো একটা রেল উপনিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে আমি যেমন একদিক থেকে জন্ম নিঃসঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত হচ্ছিলাম, তেমনি ঐ একই উপনিবেশ আমার চোখের সামনে অন্য এক জগতের দরজা খুলে দিয়েছিল।" ['সাপ্তাহিক বর্তমান', ২১.১০.১৯৮৯, পৃ:- ১৯]

'জন্ম নিঃসঙ্গ' এই সৃজনবেত্তার হাতে তাঁর নির্মিত উপন্যাসের চরিত্রেরা কতটা নিঃসঙ্গ থাকলেন এবং একাকীত্বের মুদ্রায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ভূমিতে অবস্থান করলেন— সেটা এবার দেখে নেওয়া যাক।

সাহিত্যে রসসংপৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ছন্দ এক বিশেষ মাত্রা যোগ করে। মানুষের জীবন পরিক্রমায়ও প্রয়োজন ছন্দের। ছন্দহীন জীবন মরুভূমির নিঃসঙ্গতায় পরিণত হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সকলের সঙ্গে গতি বজায় রেখেই তাকে অগ্রসর হতে হয়। একক ভাবে চলতে গিয়েই মানুষ ছন্দের গতি হারিয়ে জীবনকে করে তোলে বিপন্ন। তবুও পণ্যরতিতে আসক্ত আধুনিক সমাজ সম্পদ আহরণকেই মূল লক্ষ্য করে অবহেলা করে চলেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মধুর সম্পর্ককে। ফলত মানুষ হয়ে পড়ছে নিঃসঙ্গ, ভোগ করছে একাকীত্বের কঠোর যন্ত্রণা অর্থ-সম্পদের বিনিময়েও যা থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। আর সমাজের এই কঠিন ব্যাধির দিকটিকেই সুনিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী তাঁর উপন্যাসের কথাবয়নে।

রমাপদ'র সুদীর্ঘ রচনাকালের মধ্যে সমাজেও ঘটে চলেছে নানা পরিবর্তন। বদলে গেছে সুখের সংজ্ঞা, সাফল্যের নিরিখ, নৈতিকতার আবহমান ধারণা। তাঁর সাহিত্যকর্ম আলোচনা কালে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্তের ব্যক্তির মূল্যবোধের নিজস্ব সংকট, একাকীত্বের যন্ত্রণা। বদলে যাওয়া পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মেলাতে চাওয়া, না চাওয়ার, মেলাতে পারা না পারার জটিল অঙ্ক।

আধুনিকতার বেড়াজালে মানুষগুলো বড় অসহায়, বড় নিঃসঙ্গ। পরিবর্তিত অবস্থা তথা ক্রমশ ধসে যেতে থাকা মূল্যবোধের ধ্বংসস্তুপের মাঝখানে দাঁড়িয়েও মানুষের শুভবোধের প্রতি রমাপদ আস্থাবান। কারণ ১৪০৭ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'দেশ'-এ প্রকাশিত 'একা একজীবন' উপন্যাসে দেখা যায় চারুর মৃত্যুর পর তার স্বামী, মৃত্যু থেকে আরম্ভ করে মর্গ, শ্মশান-শ্রাদ্ধ সমস্ত ব্যাপারে অনুপস্থিত থেকে নির্লজ্জভাবে জীবনবিমার মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ে তৎপর হয়ে ওঠে। আর তার এই আচরণের পরও চারুর পরিজনেরা তার অনুশোচনা আশা করে বলে—

"...মনে মনে নিশ্চয় হবে।... মানুষতো সেজন্যই মানুষ। তার অনুশোচনা হয়। তা না হলে আমরা সকলেই তো এক একটা ডেডবডি হয়ে বেঁচে থাকতাম।"

ঔপন্যাসিক মানবতার প্রতি আস্থা রাখতে চাইলেও উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে অমানবিকতার চরম দান একাকীত্বের চরম যন্ত্রণার বিষময় ফল।

উপন্যাস কাহিনিতে দেখা যায় হৃষীকেশবাবু তাঁর সমস্ত ছেলে মেয়েদের বিবাহ দিলেও ছোট মেয়ে চারুর বিয়ে তিনি সময় মত দিতে পারেন নি। চারুর বয়স বেড়ে চলার সাথে সাথে স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ভালো পাত্র জোগাড় হলেও হৃষীকেশের এক মামাতো ভাই অবিনাশের কুটচক্রে চারুর বিয়ে ভেঙে যায়। বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে যে খুশির বন্যা দেখা দিয়েছিল, মুহূর্তে তা শোকসাগরে পরিণত হয়।

"সুখের বন্যা বইছিল যে বাড়িটায়, নিমেষের ভূমিকম্পে সেটা বিধ্বস্ত, ধসে পড়ে শুধু ইট, কাঠ, বালির ধ্বংস স্তূপ।"

পরবর্তীতে চারুর শরীর আরও ভেঙে পড়ে, যার ফলে বিয়ের বহু চেষ্টা করেও তার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। এখান থেকেই শুরু হয় চারুর জীবনের চরম পরিণতির পথ চলা।

হৃষীকেশবাবু সম্পূর্ণ আধুনিক না হলেও মেয়ের পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি চারুকে পুনরায় পড়াশোনা করান ও নিজের পায়ে দাঁড় করানোর ব্যবস্থা করে দেন। এমনকি মেয়ের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য তাঁর সমস্ত সম্পত্তি চারুর নামে করেছেন পিতার এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চারু বুঝতে পারে যে, সে যতই স্বাবলম্বী হোক, দাদাদের সংসারে চিরকাল তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। কারণ

"বেশি বয়স অবধি বিয়ে না হওয়া একটা মেয়ে
ভেতরে ভেতরে এক ধরনের মানসিক রুগী হয়ে উঠতে পারে...।"

একটি পিতৃ-মাতৃহীন মেয়ে যতই অর্থবান হোক, একাকীত্বের যন্ত্রণা, যা কিছুতেই দূর করা সম্ভব নয়, একথা তার নিকট আত্মীয়ও বোঝে না। তাই সকলের ভাবনা দূর করে চারু এক সময় মেয়েদের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে, সিদ্ধান্ত নেয় বাড়ি

বানানোর এবং সে তার নিজের বাড়িও তৈরি করে। যদিও বাড়ি করার ফলে সে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, কারণ একটি বাড়িতে একা একা কখনও সুখী জীবন কাটানো সম্ভব নয়। তার একাকীত্ব তার জীবনের নিঃসঙ্গতাকে আরও বিষময় করে তোলে। পাশাপাশি চলতে থাকে চারুকে কেন্দ্র করে আত্মীয় পরিজনদের শেল বেঁধানো ব্যঙ্গ বিদ্রুপ—

"এত বড় একটা বাড়ি তো করল, থাকবে তো একা।

....মেয়েদের আসল কাজ তো বিয়ে। সেটাই তো হল না।"

চারুও এক হতাশাবোধ থেকে বলে ওঠে,

"আমার কপালে বোধ হয় সুখ নেই। এখানে এই বাড়িটায় এসে এত ফাঁকা ফাঁকা লাগে, একা লাগে। লোকে শুধু বাড়িটাই দেখে আমার যে একা একা কান্না পেয়ে যায়, রাত্তিরে ঘুমোতে পারিনা, তা কেউ দেখতে পায় না।"

এই একাকীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই যৌবনোত্তীর্ণ চারু বিয়ে করে রামজীবনকে, রামজীবন শুধুমাত্র সম্পত্তির লোভে চারুকে বিয়ে করায় তাদের দাম্পত্য জীবন কখনও সুখী হয় না। চারুর আশা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যায়। এই অনধিকার পথ চলার মধ্যেই পথ দুর্ঘটনা তাকে মুক্তি দেয় মৃত্যুলোকে, মৃত্যুর মধ্য দিয়েই চারুর জীবন একাকীত্বের জ্বালা থেকে মুক্তি লাভ করে। তার জীবন সমস্যার সমাধান ঘটে।

সমগ্র উপন্যাস আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জীবনের একাকীত্বের চরম পরিণতির সঙ্গে জড়িত থাকে অর্থের মূল্যহীনতার প্রসঙ্গ। অর্থ অবশ্যই জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপকরণ, কিন্তু সময় বিশেষে সে অর্থ নিতান্ত অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। চারুর সাজসজ্জা তথা অলংকার বাহুল্য তার নিকট আত্মীয়দের ঈর্ষার কারণ হলেও, তার মৃত্যুর পর যখন বোঝা যায় যে এই সবই ফাঁকি, ভেতরের নিঃস্বতাকে ঢেকে রাখবার আবরণ মাত্র, তখন মনে হয়—

"মৃত্যুই হয়তো শেষ অবধি সমস্ত সমস্যার

সমাধান। মানুষকে শান্তি দেয়।"

রমাপদ চৌধুরী এই পর্যায়ের আর একটি অন্যতম উপন্যাস হল 'সাদা দেয়াল', যা ১৯৯৩ সালের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায়। উপন্যাসটি সম্পর্কে অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন "সাদা দেয়াল' মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাম্প্রতিকতম সমস্যা।" তবে 'সাদা দেয়াল' এর সমস্যাটি বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত বয়স্কদের। 'প্রসঙ্গ কথা'য় রমাপদ নিজেই সমস্যাটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

"আমেরিকা ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলি ইদানীং আমাদের সমাজে স্ট্যাটাস সিম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যেন বাঙালী সমাজের চাবিকাঠি। কথায় কথায়

আমরা সুযোগ খুঁজে নিয়ে গর্ব করে জানাতে ভালোবাসি কোন ছেলে কোন বিদেশে কত হাজার ডলার বেতনে চাকরি করছে।... তারপর একদিন সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধা বুঝতে পারেন পুত্র, পুত্রবধূ কন্যা ও জামাতাদের সাফল্য নিয়ে গর্ব করতে করতে তাঁরা একেবারেই একা হয়ে পড়েছেন। নিঃসঙ্গ ব্যর্থ বিষণ্ণ জীবনই তখন তাঁদের এক মাত্র ভবিতব্য।"

'সাদা দেয়াল' উপন্যাসের প্রবীণ কালীসাধনবাবু ও তাঁর স্ত্রী বিনোদিনীর বাড়ি-সংসার-সন্তান প্রতিবেশি ও আত্মীয়স্বজনের কাছে বলছে ঈর্ষণীয় বিষয়। তাঁদের দুই ছেলে, দুই বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি নাতনি সকলেই আমেরিকা প্রবাসী, সকলেই সুপ্রতিষ্ঠিত স্বচ্ছল। সময়মত দেশে আসে এবং এক পলকের একটু সময় অতিবাহিত করে আবার পাড়ি দেয় বিদেশে। তাদের ফিরে যাওয়ার পর কালীসাধনবাবু ও বিনোদিনীর জীবনে নেমে আসে গভীর একাকীত্বের যন্ত্রণা। সারা জীবনের কষ্টার্জিত ও সাধ্যতিরিক্ত পরিশ্রমের তৈরি করা বাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকে—

"অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা নিয়ে যে বাড়িটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন, তখন সেটিই তাদের বৃদ্ধাবাস।" (প্রসঙ্গ কথা)

বহু স্বপ্নের ইমারত তাঁর বাড়িটি— "প্রথমে একতলা, পরে দোতলায় একখানা ঘর দু'খানা ঘর এটা খোকার, তিনখানা— নান্টুর জন্যে, আরে মেয়ে জামাইওতো আসবে মাঝে মাঝে— ওদিকেরটা ওদের জন্যই থাকবে, খোকার ছেলের জন্য ওটা পড়ার ঘরও হবে। আর ছাদটুকু থাক কাপড় শুকোবার জন্যে, পরে যদি পারে নান্টুর ছেলে...। কত কি স্বপ্ন, আর ফরচুনেট লোকেদের সব স্বপ্নই কেমনভাবে পূরণ হয়ে যায়।"

অনন্তলালের মুখের 'ফরচুনেট' কথাটা মনে পড়ে কালীসাধনবাবুর হাসি পেয়েছে— শুধু দুঃখের হাসি। বাড়িটিকে কেন্দ্র করে ছেলে মেয়েদের নিয়ে একটা সম্পূর্ণ সংসারের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন কালীসাধনবাবু ও তাঁর স্ত্রী বিনোদিনী, ভেবেছিলেন—

"ছেলে মেয়েকে মানুষ করা, তাদের বড় হওয়া, মেয়ের বিয়ে, তার সুখী হওয়া, নাতি নাতনি হবে, ঘর কলকোলাহলে উপছে পড়বে...।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত

"ওঁকে একেবারে একা করে দিয়ে সকলেই চলে গেছে।
...নিঃসঙ্গ, একা নিঃস্ব।...একটা বাড়ি ওঁর চোখে বিশাল
কিন্তু জনহীন— সেই বাড়িটার যেন পাহারাদার উনি।"

কালীসাধনবাবুর সুখের সংসারে ছেলে-মেয়েরা যত বড় হয়ে উঠেছে এই প্রবীণ ব্যক্তিদ্বয় যেন ততই একাকীত্বের সিঁড়ি বেয়ে একধাপ করে এগিয়ে চলেছেন। ছেলে

মেয়েদের মানুষ করবার চেষ্টায় নিজেরা শত কষ্টে থাকলেও তাদের গায়ে কোনো আঁচ লাগতে দেননি। কিন্তু এই ছেলে মেয়েরাই বাবা-মাকে ছেড়ে নিজেদের সুখের জন্য নিজেদের অ্যাম্বিশান পূরণে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছে।

গোড়ার দিকে বাড়ি, ছেলেদের প্রতিষ্ঠা, বিদেশে যাওয়া সমস্ত কিছুই কালীসাধন বাবুর কাছেও 'ফরচুনেট' মনে হয়। তার জন্য একটু গর্ববোধও করেন তিনি। বুকের ভেতরটা যতই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল ততই তিনি তা গর্ব দিয়ে অহংকার দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করেছেন। তবে নিঃসঙ্গতার অন্ধকার ফাঁপা অহংকারে চাপা দেওয়া যায় না। হৃদয়ের এই শূন্যতা অত্যন্ত প্রবল হয়ে দেখা দেয় কালীসাধনবাবুর জীবনে বড়ছেলে সুমন্ত বাবাকে সান্ত্বনা দেয় এভাবে—

বাবা তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায় নেই? নিউজার্সি, ফিলাডেলফিয়া লস এঞ্জেলস।... ইউ শুড বি আ প্রাউড ফাদার।" সন্তানদের ওপর ভরসা রেখে মানসিক আশ্রয়তো এই পিতা মাতাদের শেষ সম্বল— ' একা হও, একা হও, একা হও, একা হও, একা' [পাথর, শঙ্খ ঘোষ] কালীসাধনবাবু মনে মনে দুঃখের হাসি হেসে বলেছেন—

"...আমি সাফল্য চেয়েছিলাম। সাফল্য মানে যে, এত বড় ট্র্যাজিডি কে জানত।... এই বিশাল বাড়িতে শুধু শূন্যতাকে সঙ্গী করে বেঁচে থাকা, সে যে কষ্ট। কেউ বুঝবে না।... আই অ্যাম জাস্ট এ প্রাউড ফাদার অ্যান্ড নাথিং এলস। আমি আর বাবা নই। তোর মা আর এখন মা নয়। ও এখন শুধুই রত্নাগর্ভা।"

রক্তজল করা বাড়িটাতে এখন শুধুই বিরাজ করে শূন্যতা। অপূর্ণ অপত্য স্নেহ তথা পার্থিব মানবিক স্পর্শের অভাবে কালীসাধনের পিতৃহৃদয় তাই সাদা দেয়ালে নাতনির অপটু হাতের আঁকিবুকিকেই প্রাণপনে আঁকড়ে ধরতে চায়, এই টুকুই সুখের স্মৃতি হয়ে দেখা দেয় বৃদ্ধ দম্পতির মনের মণিকোঠায়, শূন্যতাই আমাদের শোভা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। কালীসাধনবাবুর পুত্র যেন এক বার্তা দিয়ে যায় 'আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক' সুতরাং আমারে নিয়ে অযথা 'করিয়ো না শোক' কালীসাধনবাবুদের the vast silence-এ শুধু ধরা থাকে একাকীত্বের মুদ্রা।

'সাদা দেয়াল' এর আখ্যান সত্যিই বিষাদময়। বর্তমানের যন্ত্র সভ্যতার দিনে মানুষ প্রতিযোগিতার ইঁদুর দৌড়ের যুগে নিজেই একটা যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। ফলে অবহেলিত হচ্ছে রক্ত -মাংসের মানুষের মধুর সম্পর্ক। বৃদ্ধ দম্পতির শেষ আশ্রয় তাঁর ছেলে মেয়ে, তারাই তাঁদের নিঃসঙ্গ করে একাকীত্বের বিষময় ফল ভোগের জন্য রেখে চলে গেছে বিদেশে। তাঁদের চাওয়া পাওয়ার দাম, তাঁদের অনুভূতি ভালোবাসা সমস্তই মূল্যহীন হয়ে পড়েছে বর্তমান সভ্যতার কাছে। বিনিময়ে বর্তমান আধুনিক সমাজ দিয়েছে নিঃসঙ্গ ও একাকীত্বের নিদারুণ যন্ত্রণা।

'সাদা দেয়াল' উপন্যাসের কালীসাধন ও বিনোদিনীর শূন্য নীড়ের বেদনা জায়গা করে নিয়েছে 'বেঁচে থাকা' উপন্যাসে। ১৪০৬-এর শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত (বর্তমানে দশটি উপন্যাস-এর অন্তর্গত) এই উপন্যাসের মূল ভাববস্তু। বাইরের ভেতরের নানান টানে নবীন প্রজন্মের গৃহ থেকে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ প্রজন্মের ক্রমশ একা হয়ে যাওয়া।

এ উপন্যাসের প্রোটোগনিষ্ট হর্ষনাথ সেকেলে মানুষ। হরপ্রসাদের মতো তাঁর যৌবনেও পরিবার পরিকল্পনা কথাটার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাই বড় ছেলে অরুনের মুখে একদিন 'জয়েন্ট ফ্যামিলি' কথা শুনে তাঁর বলতে ইচ্ছে করে—

"ওরে বাঁদর, আমাদের এটা জয়েন্ট ফ্যামিলি নয়। এটা আমাদের পরিবার।"

অরুণের স্ত্রী সুমিতা বিয়ের পর থেকেই স্বাধীন সংসারের স্বপ্ন দেখতে ভালাবাসে। সংসার শাশুড়ির বিরুদ্ধে স্বামীর কাছে হাজার অভিযোগ তুলে ধরে। সব শুনে অরুণ বিভ্রান্ত মুখে অসহায়তা প্রকাশ করে এবং সুমিতাকে বোঝায় সকলে মিলে থাকার সুবিধা অসুবিধার কথা। যৌথ পরিবারে কেউ নিঃসঙ্গ নয়, একাকীত্বের যন্ত্রণা সেই হাসি খুশিতেই দিন কাটে, অসুখ বিসুখে পাশে পাওয়া যায়। তবুও সুমিতা এবাড়ি ছেড়ে আলাদা থাকতে চায়। তাই প্রথম সুযোগেই স্বামী-সন্তানকে নিয়ে নতুন ফ্ল্যাটে চলে যায়। প্রথম সন্তান বিশেষত নাতির সঙ্গে এই বিচ্ছেদে নিদারুণ আঘাত পেলেও হর্ষনাথ ও প্রীতিলতা খুশি মনেই তাদের বিদায় দেন। প্রীতিলতা ভাবে—

"সংসারের সব দায় নিজের ঘাড়েই নিয়েছি। তবু ওদের কী যে অসুবিধে হচ্ছিল, কেন যে চলে গেল, তাও বুঝি না।"

আসলে কালের নিয়মে যৌথ পরিবারের ভাঙন অনিবার্য, সেই ভাঙন ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কারও নেই। একান্নবর্তী পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ মানুষকে আটকে রাখতে পারে না, কাল প্রবাহে সে বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে। এটির কালের নিগুঢ় নিয়ম। এটিই এখন আমাদের সমাজ-বাস্তবতা। তাই হর্ষনাথ ঠিক বুঝতে পারেন জেনারেশন গ্যাপ বা প্রজন্মগত ব্যবধানের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য।

"...অপমান, অপমান। আসলে ওদের সঙ্গে আমাদের বিরাট তফাৎ ঘটে গেছে জানো।"

বড় ছেলে-বৌ ফ্ল্যাটে চলে যাওয়ার পর বদলির চাকরির সুযোগ নিয়ে মেজ ছেলে অজয় আর তার বৌ মিনাও একদিন জামসেদপুর চলে যায়। বড় দুই মেয়ের আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, এবার মেজো মেয়ের উদযোগে ছোট মেয়েটিরও বিয়ে হয়ে যায়। বাড়িতে পড়ে থাকেন এই অসহায় প্রৌঢ় দম্পতি ও তাঁদের বেকার ছোট ছেলে অশোক। একসময় টুরিস্ট গাইড়ের চাকরির প্রস্তুতি হিসেবে অশোককেও চলে যেতে হয় দিল্লী। ফাঁকা বাড়িতে দু'জনে আরও একা হয়ে যান—

"প্রীতিলতা নিজের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। সাংসারিক কাজকর্ম। হর্ষনাথ অফিসে

যান, ক্লান্ত শরীর নিয়ে ফিরে আসেন।... দুজনের মধ্যে আগে কত কথাবার্তা হত ক্রমে ক্রমে তাঁরা দুজনেই নিঃসঙ্গ নির্বাক দুটি মানুষ হয়ে পড়েছেন।"

এই অসহ্য একাকীত্বকে আচ্ছন্ন করে রাখে ভয়। হর্ষনাথের অবসর গ্রহণ, সামান্য যা সঞ্চয় তা মূল্যবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিতে পারবে কিনা তার চিন্তা, আর তার চাইতেও বড় দুশ্চিন্তা তিনি যদি আগে মারা যান তবে প্রীতিলতার কী হবে? অবশ্য একই ভাবনার উল্টো পিঠ কুরে কুরে খায় প্রীতিলতাকেও । শূন্য বাড়িতে নিতান্ত নিঃসঙ্গ এই স্বামী-স্ত্রী শুধু এক অজানা আশঙ্কা বুকে চেপে রেখে আপেক্ষায় থাকেন—

"কে কাকে ফেলে আগে চলে যাবে কেউই জানে না। জানতে পারে না।"

তবুও এই চূড়ান্ত নৈরাশ্যবোধজাত জীবনের মধ্যেও দুজনেরই কোথাও যেন বাঁচার ইচ্ছেটা রয়ে যায়।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলির সামগ্রিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে আধুনিক একান্নবর্তী পরিবার ও তার ভাঙন রমাপদ-র উপন্যাসগুলিতে একটি পুনরাবৃত্ত বিষয়। আধুনিক একান্নবর্তী পরিবারের জ্ঞাতি কুটুম্বের স্থান নেই। মা-বাবা ও তাঁদের সন্তান সন্ততিকে ঘিরেই এই পরিবারের বৃত্ত সম্পূর্ণ। কিন্তু ছেলেরা যখনই বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ায় তখন তারাও চায় স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে একটি স্বাধীন সংসার, যেখানে গুরুজনদের মেনে চলার বা মানিয়ে চলার দায় নেই, সেই সংসারে বাবা-মা, ভাই-বোন অন্য কারো স্থান নেই। আর এখান থেকেই শুরু হয় সম্পর্কের সংকট। মানুষের মধ্যে দেখা দেয় নিঃসঙ্গতা - একাকীত্ব, যা মানুষের জীবনকে করে তোলে দুর্বিসহ যন্ত্রণাময়। এই যন্ত্রণাময় অস্তিত্বিক সমস্যা বা ব্যক্তিগত স্তরে সম্পর্কের সংকটকে রমাপদ চৌধুরী দেখলেন তাঁর সমকালীন বাস্তবতায় কালিক চেতনার দর্পণে। একারণেই বুঝি অধ্যাপিকা শম্পা চৌধুরী আমাদের দৃষ্টি অকর্ষণ করেন "স্বাধীনতার সময় থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী অর্ধশতকেরও বেশি সময়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে যে নিঃশব্দ পালাবদল ঘটে গেছে তার একটি অনুপুঙ্খও দৃষ্টি এড়ায়নি। তাঁর সাহিত্য কর্মে আমাদের এই অতি পরিচিত জগতের ক্রমশ বদলে যাওয়ার ধরনটি যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা শুধু সাহিত্য পাঠকের নয়, সমাজ বিজ্ঞানীর কাছেও সমান আগ্রহ ও কৌতুহলের বিষয়।"

[মধ্যবিত্ত মুখ ও মুখোশ পৃ: ১১২]

আর লেখক স্বয়ং মানুষের একাকীত্বের যন্ত্রণা ও তদজনিত তাঁর অসহায়তাকে দেখেছেন খাবিজ উপন্যাসে, 'প্রসঙ্গ কথা'-অংশে এর গুড়ার্থ সংজোন করেছেন এভাবে

'...সমাজ প্রধান অপরাধী, কিন্তু আমরাও সমান অপরাধী। এই সমাজটার দিকেও তাকিয়ে দেখুন গ্রামের বৃদ্ধ বাপ ছেলে মেয়ের মুখে অন্ন জোটাতে পারে না বলেই তার বালক পুত্রটিকে গৃহভৃত্য করে নিতে বাধ্য হয়...। গ্রামের মানুষ একা নিঃসম্বল,

দারিদ্রের ফলে নিজের ছেলেকেও সে এক্সপ্লয়েট করতে বাধ্য হয়, কিন্তু সন্তানস্নেহ মরেনা। সে বুক ফাটা আর্তনাদ নিয়ে কাঁদে এবং ফিরে যায়। মধ্যবিত্ত মানুষ এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে নিজের অসহায়তাকে দায়ী করে।"

এই অসহায়তাই রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাস— বিশ্বের অন্যতম ধ্রুবপদ। কিন্তু শিল্পী ও সমাজসংস্কারের দ্বন্দ্ব রমাপদ চৌধুরী বেঁচে থাকার দর্শনে মানুষের একাকীত্বের মুদ্রাকে এক জীবনসত্যে বাস্তবায়িত করে তুল ধরেন।

তথ্যসূত্র :

১। 'একা একজীবন'—রমাপদ চৌধুরী, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০০২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.। কোলকাতা-৯ পৃষ্টা-১২৬।

২। 'সাদা দেয়াল'— উপন্যাস সমগ্র (৬)-রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি-১৯৯৬। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.। কোলকাতা-৯। পৃষ্ঠা-২০৫

৩। 'বেঁচে থাকা', দশটি উপন্যাস— রমাপদ চৌধুরী, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০১। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.। কোলকাতা-৯। পৃষ্ঠা-১৭৯

৪। 'রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প'— শম্পা চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ—২০১০। এবং মুশায়েরা। কলকাতা-৭৩।

ই ন্দ্র নী ল ভ ট্টা চা র্য

সন্ন্যাস

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায়
পড়াশোনার ঘরে এসে বসি।
চারপাশ নিঃঝুম—
শুধু দেয়াল ঘড়ির টিকটিক শব্দ
শব্দ ক্রমশ বাড়ছে।
এই শব্দটুকুর মধ্যে ডুবে আছে
অতলান্ত নীরবতা।
এই শব্দটুকুর মধ্যে মিশে রয়েছে
রাজ্যের সরবতা
এখন মাঝরাত—তাই আলাদা করা যাচ্ছে না।
এই দুইয়ের বাঁধনে সবথেকে বেশি
যার কথা মনে পড়ে,
তাকে নিয়েইতো সংসার!
তাকে নিয়েইতো সংসার!

অ চি ন মি ত্র

নৌকাডুবি

পুলকিত নৌকো ভাসে সম্মত নদীতে। প্রণয়ের বিস্তৃত
অক্ষরমালা
জলজ কবিতাগুলি বাড়ে। উজ্জীবিত লতাদের মতো
আকাশকে
সীমারেখা ভাবে, ফিরেছে স্বদেশে যেন প্রবাসের শেষে।
দূরাগত সুরে বাজে স্পন্দন, হৃদয়ের থেকে দূরগামী।
পথটি চিনিয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যাও। শিহরণ তুমি তাকে
শোনো। কিছু পরে ডাক দেবে নদী। দিনের আলোয়
নৌকোটি ডুবে যাবে প্ররোচনা ছাড়া।

শ ঙ্ক র ঘো ষ

কুয়াশার বুকে

কুয়াশার বুক চিরে, অভিমানী সেই নৌকোটা
এখনো স্থির হয়ে আছে...
মনে হল, মুহূর্ত শ্রাবণ পেরিয়ে শীত এল
কুয়াশার মৌনপুরে— অভিযোগ বৃষ্টির ফোঁটায়
সমস্ত অক্ষমতার নিজস্ব অক্ষরের ছায়া ফেলে
একটা শ্রাবণও চুপ হয়ে যায— মন নদীর
নৌকোটাকে স্থির করে রেখে...
তবুও, এই শীতে বিন্দু বিন্দু ঘামে-তিরতির
বয়ে যাওয়া স্রোত চাঁদমাখা জ্যোৎস্নার অভিসারে
স্পর্শ নেই, অথচ স্বয়ম্ভু হাওয়ায় মগ্নমৈনাকে
কৃষ্ণগহ্বরে স্বরলিপি লেগে একটা গল্প
পঞ্জিকা পাতায় মনপন নিরুত্তাপে...
যেন, আধকুয়াশা কাঁটায় গাণিতিক দূরত্ব মেপে
সত্য সরল হয়েও এনড্রয়েডে ছায়া ফেলে
স্থির হয়ে আছে...

খে য়া স র কা র

রিস্ট ওয়াচ

গলায় আটকে থাকা জীবন
কোন নামে ডাকি বলো তোমায়
কতবার কত অমাবস্যা পেরিয়ে
নুপুরের ছন্দে বাজে
প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া
অথচ পূর্ণিমা গিলে খায় মেঘ
যদিও বৃষ্টি আসে না
শুকনো মাটি ফুটিফাটা
গাছ লাগানোর শপথ মরে যায় রোজ
অচেনা আতঙ্কের অশনি সংকেত
দেখবো না ভেবে
ঘাড় ঘোরাব গিয়ে
খাবি খায় সময়
রিস্ট ওয়াচ খুলে রাখি
সাপের ছুঁচো গেলা দেখব
ভিড় হবে হয়তো
সামনের রাস্তা থেকে ঝাঁট দিয়ে সরিয়ে দিই
দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন...

তনুজা চক্রবর্তী

কেন যাব

যাব বলেই এসেছিলাম
অথচ, আসার পরে যাবার কথা ভুলেছি!
যেতে হবে শুনলেই,
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন
অ্যালার্মের মত বাজতে থাকে।
"যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?"
রাত জানে কেন তাকে যেতে হয়,
ফুল ঝরে কুঁড়ির আভাসে।
আমার যাবার পথে আঁখিজল করে টলমল,
তীর জানে ফিরবে না ভাঙা ঢেউ—
তবে কেন যাব?
আমার যে মালা গাঁথা
বাকি পড়ে আছে,
দিয়ে যাব কাকে, সে কি নেবে চিনে ?
সে শব্দ শবরীদের !

সু স্মে লী দ ত্ত

ফ্যান্টাসী

সম্ভবত রাত বেড়েছে ধীরে
সম্ভবত নদীর শঙ্খ লাগ
ঈশ্বরী সে দুহাত মেঘের পরে
শান্ত ঠোঁটে অযূত চার্বাক

সম্ভবত মনবাতাসে চুপ
ই-শারীরিক বিষুবজলে স্নান
অক্ষসীমা পাগল ভুঁয়ে মাথা
সবাক ধনু নষ্ট অভিমান

সম্ভবত আয়না ভাসে জলে
ওপারে কোন উল্টো প্রতিচ্ছবি
অচেনা মন অদূরভাষী যেন
মন অচানক হিংস্র মহাকবি

ভাবছি যত চাপছে স্মৃতিভার
অতীত ন্যাড়া ভবিষ্যতের চুল
ঝাঁকড়ামনে ইচ্ছেগুলো থাক
হোক না তারা নিহত শার্দুল

রাত বেড়েছে ধীরে, অনেক ধীরে
আঁধার নামে ক্ষুদ্র নীড়টিরে
এরপরে যা কল্পনাতে থাক
না-কবিতায় মিথ্যেরা প্রাণ পাক

সু শী ল ম ণ্ড ল

ছুটছি

ছুটছি একটা বন্ধ দরজার দিকে
যার চাবির হদিশ আমি জানি না।

ছুটছি একটা বুলেটবিদ্ধ দেয়ালের দিকে
রক্তের দাগগুলি কাদের কেউ আমাকে বলেনি।

ছুটছি একটা অন্ধকার গলির দিকে
সেখানকার নিরপরাধ লাশগুলো আমি চিনি না।

ছুটছি একটা কাপালিকের রক্তবর্ণ চোখের দিকে
ধর্মবিশ্বাস এসব নিয়ে কেউ আমাকে প্রশ্ন করেনি।

সৌমিত বসু

শকুন্তলা

অশিক্ষিত বনকন্যা শকুন্তলার
যেটুকু সম্ভ্রম ছিলো
বুকে ভর করে চলা
অনেক মানুষের ভাগ্যে
সেটুকুও জোটেনি
সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠানকে কেউ যদি
সপাটে থাপ্পড় মেরে থাকে
সে আমাদের শকুন্তলা,
পরজন্মে যে অহল্যা হয়ে জন্মেছে
কিংবা ইলা মিত্র,
যাদের পায়ের ছাপ ধরে মানুষ
কিছুদূর পর্যন্ত যায়
কিন্তু পৌঁছনোর আগেই হারিয়ে ফেলে পথ
সে ভুলে যায়, সে শুধু নিজের বঞ্চনার কথা
বলতে আসেনি
চিরকালীন অবজ্ঞার স্রোত
জানাতে এসেছে একটা খোলা মাঠে,
উচ্ছিষ্টের মতো দুটো রুটি
কিংবা একপাতা লেখার বিনিময়ে
যারা সমঝোতা করে
তাদের বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে
শকুন্তলা কিন্তু নাকচ করে দিয়েছে
রাণী হবার প্রস্তাব
সারাজীবন কিছু না পাওয়া

শকুন্তলা যা পারে,
আমাদের সব পাওয়া বহুরূপীরা কেন
সেটুকুও পারেনা?

তাই শকুন্তলা কোনো মেয়ে নয়,
নয় পাটরানী, প্রতিদিনের আকাশে
ভেসে বেড়ানো এক আগুনরঙা মেঘ,
প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা যার অঙ্গের ভূষণ

অ লো ক দা শ গু প্ত

“না রঙ শব্দ...”

শব্দের মধ্যে আমি ছুটছি হয়তো
তুমিও বাঁক খাওয়া নদীর জল
মিশে যাচ্ছে শব্দের গভীরে
কোনটা অস্থির কোনটা ঘরের কোণায়
পড়ে থাকা জঞ্জাল স্থবির
যদিও নেতা নেত্রীর রঙ ছোঁওয়া
শব্দে আয়নায় মুখ নেই
আছে কতকগুলো বটের শিকড়
হাসছে দোমড়ানো মুখে
আমার অবস্থানটা কেমন যেন নির্ণয়হীন,

তুমিও কি তাদের মতো চোখে...

পা প ড়ি দা স স র কা র

দেখা হলে

মুখ গুঁজে হাতে নিয়ে বই পড়া প্রায় ভুলে
গেছি
সরাসরি তাই অনলাইন ই-বোক খুলি আর
সাইকেল নিয়ে হারিয়ে যায় দেবাশিসরা
ঘামের দাগের মত সবুজ হয়েছে শহর
ব্যস্ত রাস্তায় মুখোমুখি দেখা
অনবরত সেল ফোনে রিংটোন...
কবি জিরোচ্ছেন
সমস্ত কবিতার স্টল ফাঁকা
আমি খুঁজি অনবরত
কবিকে।

অ জ য় কৃ ষ্ণ ব্র হ্ম চা রী

গোপন

সেই ছোটবেলা এক টাকার কয়েন পেয়ে
পৃথিবী পেয়েছি, বলব না। কোনও ধারনাই জন্মায়নি তখন
যে কোনও বিনিময়ে কয়েন ছাড়িনি

গোপন রাখা সেই সব টাকাগুলো এখন
ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখি
উদারভাবে মেলে রাখি, গোপনের ইতিহাস শুধু হাসে

ফেলে রাখা জামা-কাপড়গুলো জড়িয়ে নিই
তুমি এসে ফেলে দাও, বাধা তো দিতেও পারি না
ছেলেবেলার গোপন ছবিগুলো স্মৃতিতে বড় বেশি বেদনা ছড়ায়।

লুকিয়ে রাখা টাকা-পয়সা ধীরে ধীরে ব্যয় হতে থাকে

সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা

দূরের পাখিরা

প্রতিদিন উড়ে আসে
জানালার গ্রীল, ছাদের কার্ণিসে...
মনের উঠোনে রেখে পা
উড়ে যায় চিহ্ন নিয়ে
দিগন্তরেখায়।

বৃষ্টি থেমে এলে

জলের বুকেতে পা
ছপ্ ছপ্ পারাপার হলে।
জল জানে - হৃদয়ে তার
কতটা কম্পন, কতটা জ্যামিতি

ম নী ষা সা হা

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে মধ্যবিত্তের সংকট

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম মাইলস্টোন রমাপদ চৌধুরী। যিনি সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে দেখেছিলেন। একটা মানুষ কীভাবে বাঁচবে তাঁর সমস্ত দায়িত্ব যেন সমাজ নিতে চায়। একটা গোষ্ঠী থেকে হয় সমাজ, যেখানে কোনো মানুষ বা পরিবারকে কেন্দ্র করে তার উপর অধিকার ফলাতে চায়। তাকে গ্রাহ্য করে না ঠিকই কিন্তু অগ্রাহ্যও করে না। সবাই তাকে বুঝিয়ে দিতে চায় সে গুরুত্বহীন। এর ফলেই জন্ম নেয় একাকীত্ব, যা অনেকসময় মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। কিন্তু দ্বেষ-বিদ্বেষে গড়া এই চিরায়ত বাস্তবের মধ্যেই অনেক মানুষ সমাজের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলিদান না করে বাঁচার রসদ খুঁজে নিয়ে একাকীত্বকে বরণ করে গড়ে তোলে এক স্বচ্ছন্দ জীবন। সমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায় নিজেকে এবং এইভাবেই ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয় সমাজ। সমাজের এই বিভিন্ন ধারার পরিবর্তন দেখেছিলেন রমাপদ চৌধুরী। তাই তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেই যুগ যন্ত্রণার মধ্যে জীবনের বীজ রোপণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনসংকট। এই মধ্যবিত্ত মানুষদের প্রধান সমস্যা হল- অনেক কিছু মানিয়ে নিতে বাধ্য হওয়া। এর অন্যতম কারণ হিসাবে বলা যায় টাকা। কারণ এই টাকার দ্বারায় মানুষ সমাজের ন্যায়-অন্যায়গুলোকে তোয়াক্কা না করে নিজের সম্মান নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু মধ্যবিত্ত মানুষেরা টাকার অভাবে না পারে সমাজের অপরাধগুলোকে ভেঙে ফেলতে না পারে গরিবদের মতো নিচু চোখে নিজেকে দেখতে। সমাজে টিকে থাকার জন্য সবার মন যুগিয়ে চলতে হয় নাহলে তুমি একা, একঘরে। আবার মধ্যবিত্তরা নিজেদের আধুনিক করতে চায়, বাইরে চেহারাটা অনেকটা পাল্টে দেয়, কিন্তু ভিতরে থাকে সেই প্রাচীনপন্থী সংস্কার। সুতরাং নিজের আমিত্বটাকে গড়ে তুলতে গিয়ে তাকে অনেক বাধা পেতে হয় মধ্যবিত্তদের। প্রথমেই একটা কথা মনে আসে তা হল-লোকে কি বলবে ? চারপাশের মানুষদের কৌতুহল, নোংরা দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য সে পালাতে চায়। কিন্তু পথ পায় না। সমাজ থেকে পাওয়া হিংসা লোভ, রাগ-বিদ্বেষের ফলে মানুষের মধ্যে যে হতাশা-ক্ষোভ-ক্লান্তি আসে তা থেকে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হয় রমাপদ সেই কাহিনীই বলেছেন। তাঁর লেখা সেই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প—

১. 'খারিজ ': প্রথম প্রকাশ শারদীয় দেশ ১৩৮১(১৯৭৪)
২. 'বাড়ি বদলে যায়' : শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৮৫ গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ বইমেলা ১৯৮৬
৩. 'স্বার্থ' : শারদীয় দেশ ১৯৯০। গ্রন্থাকারে প্রকাশ জানুয়ারি (১৯৯১)
৪. 'অহঙ্কার' : শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৮৯ গ্রন্থাকারে প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯০।

'খারিজ' উপন্যাস সম্পর্কে লেখক স্বয়ং বলেছেন—

'' গোটা সমাজের সার্বিক বিশ্লেষণ ঘটনা এবং তার কার্যকারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে যূথবদ্ধ মধ্যবিত্ত সমাজের আকৃতি, প্রকৃতি এবং তারই মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রকে চিরে চিরে দেখার আত্মসমালোচনাই এর উদ্দেশ্য ছিল।''[১]

এই সমাজ প্রধান অপরাধী, কিন্তু আমরাও সমান অপরাধী। উপন্যাসে দেখা যায় একটি বারো বছরের ছেলে নাম পালান, যে তার বাবার একমাত্র ছেলে কিন্তু অত্যন্ত দারিদ্র্যে, অভাবে ক্লান্ত— রোগা ছেলেটিকে তার বাবা শহরের এক বাড়িতে ভৃত্যের কাজে লাগায়। ''একদিকে তার সান্ত্বনা ছেলে খেতে পাবে, অন্যদিকে লোভ সে নিজে কুড়িটি টাকা পাবে মাসে মাসে।''[২] উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জয়দীপ যে দুশো টাকায় নটবর রায় বাবুদের বাড়িতে ভাড়া থাকে। এই জয়দীপের ঘরেই পালান কাজ করত। এই পালান শীত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভেন্টিলেটর না থাকা রান্নাঘরে দরজা বন্ধ করে কাঠকয়লার আগুন জ্বেলে তাপ নেওয়ার সময় কার্বন-মনোক্সাইডে মারা যায়। কিন্তু তার মৃত্যুই সকলের অন্যায়বোধগুলোকে জাগিয়ে দেয়। আমাদের ছোটো ছোটো অন্যায়ের দ্বারাই সমাজ অপরাধী হয়ে ওঠে।

ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ অন্যায়ের কাছে হার মেনে নিজের মূল্যবোধ বিসর্জন দেয়। পালান সেই বিসর্জিত মানুষ। আবার গরিবের উপরে মধ্যবিত্ত সমাজেও দেখা যায় মানুষের সামান্য সহানুভূতির অভাব এবং সততার মূল্য দিতে না পারা। অথচ অন্যের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হয়। পালান, যার এখন স্কুলে যাওয়ার কথা সে জয়দীপের পাঁচ বছরের ছেলে টুকাই-এর স্কুলব্যাগ হাতে করে বাসে তুলে দিতে যায়। সে বাড়ির চাকর। এই 'চাকর' শব্দটি ডাক্তার বাগচির মুখ থেকে শুনতে জয়দীপের খারাপ লাগে। সে চাকর না বলে পালানকেই বোঝাতে চায়। অথচ যে আইনের চোখে শিশুশ্রমিক অন্যায়, জয়দীপ সেই অন্যায়টাই করছে। জয়দীপের স্ত্রী অদিতি অনেকদিন ধরে বিভিন্ন চাকরদের ব্যবহার করা তেলচিটে ময়লা বিছানায় পালানের ব্যবস্থা করে। রায়বাবু তার রান্নাঘরে ভেন্টিলেটর রাখেনি। এই রায়বাবু স্বার্থের জন্য দৈনন্দিন কলহ সত্ত্বেও জয়দীপের সাথে মিল করতে যায় যাতে জয়দীপ পুলিশের কাছে রান্নাঘরে ভেন্টিলেটর নেই কথাটি উল্লেখ করে না। আবার জয়দীপও রায়বাবুকে তোয়াজ করে চলতে চায় কারণ রান্নাঘরের দরজা যে উনিই ভেঙেছেন সেই সাক্ষী হিসাবে। এর মধ্যে দেখা যায় পাড়ার কিছু মানুষ যারা সহজ বিষয়কে জটিল করে তোলে যেমন নিশীথবাবু, শিবশঙ্করবাবু। এই ভেন্টিলেটর

না থাকায় জয়দীপ পালানের মৃত্যুর জন্য রায়বাবুকে দায়ী করে, অদিতিকেও দায়ী করে।

"আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, অদিতির অবহেলাই পালানের মৃত্যুর জন্যে দায়ী। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমার অবহেলাও তো আরেকটা মৃত্যুর জন্যে দায়ী—। একজনের নিঃশব্দ গোপন ভালোবাসাকেও তো চোখ মেলে দেখতে চাইনি একদিন, নিতান্ত অবহেলাতেই তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিলাম।"

এই একজনটি শ্যামলী, অদিতির বান্ধবী। যে শ্যামলী জয়দীপকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু জয়দীপ তা জানত না এবং সে ভালোবেসে ফেলে অদিতিকে। কোনো একদিন শ্যামলী তার সেই চাপা দুঃখটা জয়দীপকে জানালে মুহূর্তের দুর্বলতাবশত জয়দীপ শ্যামলীকে আলিঙ্গন করে বসে। কিন্তু পরক্ষণে সমস্ত দোষ আক্রোশ শ্যামলীর উপর দিয়ে মেটাতে চায় বার বার, নিজের অন্যায়টাকে না মানার জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের এই স্বার্থ নিয়ে চলার রূপ ও ব্যক্তিমানুষের একটি চিত্র দেখিয়ে রমাপদ আমাদের আর একটি বিচারবোধকে জাগিয়ে তুলেছেন। জয়দীপের ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু অভিজিৎ যে টাকার গর্বে চাকরকে দিয়ে জুতো খোলায়, তাতে জয়দীপ অপমানিত বোধ করলে নিজের মনে মনেই তর্ক করতে থাকে—

> " অভিজিৎ, তুই যতই ওপরে উঠছিস ততই নীচে নেমে যাচ্ছিস। লোকটা তোর ভৃত্য হতে পারে, কিন্তু মানুষ। মানুষের মর্যাদা দিতে শিখলি না।
> মনুষ্যত্ব কি জিনিস তুই জানিস না!
> অভিজিৎ হাসতে হাসতে বললে, প্রচন্ড শীতে বারো বছরের একটা বাচ্চা ছেলেকে সিঁড়ির তলায় কিংবা বারান্দায় শুতে দেওয়ার নাম মনুষ্যত্ব?
> —কিন্তু আমি মানুষকে অপমান করি না। তুই তাকে জুতোর তলায় থেতলে দিচ্ছিস। অভিজিৎ যেন রেগে গেল।— তুই তো মানুষ খুন করিস। মার্ডারার।"

যদিও পালানের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, তবে অ্যাডভোকেট পরমেশ্বরবাবুর মতে "নেগলিজেন্স ইজ অ্যান অফেন্স" অর্থ্যাৎ " অবহেলা করা একটা অপরাধ"— এই কথাটাই জয়দীপকে যেমন বিচার করাচ্ছে সেই সঙ্গে লেখক আমাদেরকেও কতর্ব্যজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন করাচ্ছেন, যা পালানের মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যিই বিচার্য। জয়দীপ নিজেকে আরও আত্মবিশ্লেষণ করে বলে—

> " আমি বোধহয় অভিনয় করছি। ডাক্তার ডেকে এনে নিরপরাধ সাজতে চাই। কাল রাত পর্যন্ত। ওর ওপর আমার মায়াममতা ছিল ঠিকই, ওকে একটা সোয়েটার কিনে দিতে হবে বলে অদিতির সঙ্গে পরামর্শ করেছি। কিন্তু আজ ও আমাকে বিপদের সামনে দাঁড় করিয়েছে বলেই সত্যিকারের কোন মায়াममতা আজ আর নেই। ওকে বাঁচানোর জন্যে আমার যদি প্রবল আগ্রহ থাকতো তা হলে প্রথমেই দরজাটা ভেঙে ফেলিনি কেন! আসলে আমি বোধহয় সাক্ষী চাইছিলাম একজন! কারণ নিজেকে বাঁচানোর কথা ভেবেছিলাম।"

এরপর করোনারের কোর্টে পালানের মৃত্যুর সত্য কারণ সম্পর্কে জানা যায়। কার্বন-মনোক্সাইডে তার মৃত্যু এবং বিচারের রায়ে শোনা যায়- "ইট ওয়াজ এ কেস অফ প্লেন অ্যান্ড সিম্পল অ্যাকসিডেন্ট। অ্যান্ড হেন্স দি কেস ইজ ক্লোজড" তখন জয়দীপ-অদিতির মুখে আনন্দের হাসি ফুটে ওঠে।

একটা ভিখিরি বাচ্চা কেন ভিখিরি হলো কেউ খোঁজ নেয়না, কেউ না খেতে পেয়ে মরে থাকলেও কারো মায়া-দয়া হবে না, কিন্তু তার হাঁটুতে একটু রক্ত বের হলেই জনতার মাথায় রক্ত উঠবে, বা তার মৃত্যু ঘটলে তদন্ত শুরু হবে। আর তখন সবার মুখেই বুলি ওঠে— আসলে দায়ী তো সোসাইটি- দি সিস্টেম। যেমন অদ্ভুত দেশ, তেমনি অদ্ভুত গর্ভনমেন্ট। অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা সমাজকে দোষী করি, নিজেকে অসহায় মনে করে নিজের দোষটা ঢাকি। রমাপদ চৌধুরী আমাদের এই সংকোচটাতে কুঠারাঘাত করেছেন।

মধ্যবিত্ত মানুষদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে তাদের স্বভাবও যে বদলে যায় লেখক সেই দিকটি তুলে ধরেছেন 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসে। ধ্রুব মধ্যবিত্ত ঘরের এক ভাড়াটিয়ার ছেলে। তার বাবা-মা, দুই দাদা-বৌদি তথা পুরো পরিবারটা কম টাকায় ভাড়া থাকত হরিশ মুখার্জি রোডে। একটা জমি কিনে বাড়ি করার সামর্থ্য তাদের ছিল না বা থাকলেও গুরুত্ব দিয়ে করেনি। কিন্তু একটি নিজস্ব বাড়ি ও ভাড়া বাড়ির মধ্যে যে কত পার্থক্য থাকে সেটা তারা সর্বদা অনুভব করতে পারত। ভাড়া বাড়ি মানেই সর্বদা মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক-ভয় কখন বাড়ির মালিক ভাড়াটিয়াদের তুলে দেয়, তখন মাথাগোঁজার জায়গা না খুঁজে পেলে আত্মসম্মান চলে যাওয়ার লজ্জা পেয়ে বসে। এই আত্মসম্মান মধ্যবিত্ত মানুষদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এটাকে তারা আগলে রাখতে চায়। এই ভাড়াটিয়াদের মধ্যে যারা ভাগ্যবান তারা মাথার উপরে নিজস্ব একটি ছাদ তৈরি করে নেয়। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্বভাবও বদলে যায়, পেয়ে বসে অহঙ্কার। ধ্রুব তার দুই দাদা-বৌদিদের সাথে হরিশ মুখার্জি রোডের ভাড়াবাড়িতে থাকতে অসুবিধা হওয়ায় স্ত্রী প্রীতি ও ছেলে টিপুকে নিয়ে বকুলবাগানের তিনতলা বাড়ির একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেয়। এই বাড়িটা ছিল ধ্রুবদের হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনে। আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল একটি বাড়ির সামান্য ভাড়াটিয়া রাখালবাবুর, যাকে ধ্রুবরা একসময় নীচু চোখে দেখত, যাকে ধ্রুব একবার ইংরেজিতে একটি অভিনন্দন পত্র লিখে সাহায্য করেছিল; আর্থিক দিক থেকে ফুলে-ফেঁপে ওঠা সেই রাখালবাবুরই বাড়িতে ধ্রুব ভাড়া নিলে মন থেকে সংকোচ যেত না। এড়িয়ে চলতে চাইত কিন্তু সর্বদাই মনের মধ্যে ভয় থাকত যদি এই ব্যবহারে উঠিয়ে দেয়। এই ভয়টা ধ্রুবর আরও বেশি পেয়ে বসেছিল একদিন ব্যাঙ্ক

থেকে টাকা তুলে আনার পথে। বকুলবাগানের গলিতে ঢোকার মুখে দেখে এক ভাড়াটিয়ার উচ্ছেদ, চরিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা বাসনপত্র , পাড়ার লোকের সামনে এমনভাবে অপদস্থ হওয়ায় লজ্জায় মুখ নীচু করে বসে থাকা ভদ্রমহিলার অশ্রুহীন মুখ। তাই বার বার ধ্রুব অফিসের বন্ধু অবিনাশ-সুনন্দের কাছ থেকে আশ্বস্ত পেতে চায় ভাড়াটে তুলে দেওয়া কষ্টকর, আইন ভাড়াটের দিকে। তবুও নিজের চোখেই দেখা ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ বা তার ছোটমাসিদের সঙ্গে বাড়ির মালিকের ঝগড়া হওয়ায় তাদের উপর কেস করে টাকা নষ্ট হওয়া, তারপরে হন্যে হয়ে বাড়ি খোঁজা, এমনকি রাখালবাবুরই বাড়িতে ভাড়া থাকা ধ্রুবর পাশের ভাড়াটিয়া বঙ্কিমবাবুকে উচ্ছেদের নোটিশ ধ্রুবকে সবসময় দুশ্চিন্তায় বিব্রত করত। কিন্তু ভাগ্যবান ধ্রুব ধনী পিসেমশাইয়ের বদান্যতায় একটা জমি পেয়ে যায় এবং কন্ট্রাক্টর জগন্নাথবাবুও ধ্রুবর বাড়িটা দোতলা তুলে সুন্দর রঙ করে চাকচিক্য করে দেয়, যা ধ্রুবর কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়। আর্থিক স্বচ্ছলতায় এগিয়ে ধ্রুব তার নতুন বাড়ির বাড়িওয়ালা হয়ে ওঠে। দেনা শোধের জন্য ধ্রুবর একদিকে যেমন মনে হয় ভাড়া দেওয়ার, একদিকে চায় না কারণ ভাড়াটিয়া সহজে উঠতে চায় না। আর বাড়িওয়ালা হয়ে নিজেদের স্বার্থ মতই অবাঙালিদের ভাড়া দিলেও বাঙালি বা আত্মীয়কে ভাড়া দেবে না। তাই বাড়ি খুঁজে না পাওয়ার জন্য হতাশায় ভুগান্তি ছোটমাসিদের বিপদের দিনেও ধ্রুব ভাড়া দেয়নি। অথচ নিজেই একদিন বাড়ি ভাড়া না পাওয়ায় হতাশার মধ্যে ছিল। শুধু তাই নয় ভাড়া উঠতে না চাইলে ভাড়াটিয়া উঠিয়ে দেওয়ার কলা কৌশলও শিখে নেয় প্রীতি। কিভাবে কল বন্ধ করে জল না দেওয়া যায়, যার জন্য ধ্রুবকে রাখালবাবুর বাড়িতে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। এমনকি কেউ ভাড়া চাইতে আসলে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে ধ্রুব বলে- "শালা ভাড়াটেদের জ্বালায় টেকা দায়।" অথচ একসময় বাড়ি ভাড়া খুঁজতে গিয়ে বাড়িওয়ালাদের বিভিন্ন ব্যবহারে সে অপমানিত বোধ করত। নতুন করে তারই বাড়িওয়ালা জীবনবাবুকে ভালো লেগে যায় এবং ভাড়াটিয়া বলে সুখেনবাবুদের উপর বিরক্ত হয়। সেই পাড়ারই অরিন্দমবাবু প্রাচীনপন্থী হলেও তিনি ধ্রুবর বাড়ির ট্যাক্স কমিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করলে ধ্রুবর তাকে আপন বলে মনে হয়। অথচ যারা মেলামেশা করতে চায় তাদের সাথে ধ্রুব প্রীতিকে মিশতে মানা করে দেয়, বিশেষ করে বাড়ির ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে। কিন্তু ধ্রুব ছোট থেকে ভাড়াটিয়া পরিচয় নিয়ে বড় হয়ে ওঠে। বাড়ি বদলে যাওয়ার সাথে সাথে ধ্রুবও বদলে যায়। রমাপদ বুঝিয়েছেন এইভাবেই অহঙ্কার মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে।

'স্বার্থ' উপন্যাসটিতে রমাপদ সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে, উপন্যাসের মূল চরিত্র জয়াকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসটির 'স্বার্থ' নামকরণে টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনো স্বার্থ এখানে বড় হয়ে ওঠেনি। আসলে আমরা সবাই মায়ার বন্ধনে থাকি ঠিকই কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই একটা স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। আমাদের

ছোট ছোট ইচ্ছা বা প্রয়োজন পূরণ না হলেই আমরা যেন স্বার্থপরের মতো কাজ করতে চাই। এই মূল গল্পটির মধ্যে রমাপদ মধ্যবিত্তের যে মানসিকতা দেখিয়েছেন তা হল— মধ্যবিত্ত মানুষেরা ধনীদের মতো আদবকায়দা করতে চায়, বাইরের পোশাক-আশাক, ঘরের ফার্নিচারে নিজেকে মডার্ন দেখাতে চায়, কিন্তু ভিতরে গুছিয়ে রাখে গোঁড়া প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারা। এই মানসিকতার একটা ভাবনা হল, বিয়েই মেয়েদের একমাত্র গতি। মেয়েরাও বিয়েকে নিজের দাঁড়ানোর একমাত্র জায়গা বলে মনে করে। তাই জয়ার ননদ ছটকুর বিয়ে না হওয়ায় নিজেকে সে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেয়। আবার জয়ার শাশুড়ি জয়াকে ঘোমটা দিতে মানা করে, জয়ার শ্বশুর বৌমা না বলে নাম ধরে ডাকে, জয়ার স্বামী সুকল্যাণ মারা গেলে তার বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তার বাবা তাকে মাছ খেতে বলে, তার দাদা রঙিন শাড়ি পরতে বলে। কিন্তু জয়া যখন তার নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য অনিমেষ নামে একজনকে সঙ্গী হিসাবে পেতে চায় তখন সবারই ধারণা বিধবা হয়ে বিয়ে করলে দুই পরিবারের সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে তখন সবাই অধিকার ফলাতে থাকে। আসলে মধ্যবিত্ত মানুষেরা সমাজকে ভয় পায়, তাই সমাজ যা চায় সেটাই তারা আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। স্বামী সুকল্যাণ মারা যাওয়ার পর জয়া নিজেও ভেবেছিল—

"না রে পিঙ্কু, আমি কিছু হব না। আমি শুধু তোর জন্যে বেঁচে থাকব।"

কিন্তু জয়া পরে বুঝতে পারে তার অফুরন্ত সময়ের ওপর কতটুকুই বা ভাগ বসাতে পারবে পিঙ্কু। "একা একা 'আমি' হওয়া যায় না।"

> " আমি আবার বেঁচে উঠতে চাই।.....আমি কারো মেয়ে হব না, কারো পুত্রবধূ নই, আমি কারো বিধবা স্ত্রী নই, কারো মা নই। আমার জীবন শুধু কর্তব্য নয়। আমি ভালোবাসা দেখতে পেয়েছি। তাই কর্তব্য নিয়ে নয়, ভালোবাসা দিয়ে ওদের ভালোবাসতে চাই। পিঙ্কুকেও।"

সুতরাং এই একাকীত্ব থেকে বেরিয়ে জয়া নীজের ইচ্ছা পূরণের পথে অগ্রসর হলে মধ্যবিত্তের ব্যাকটেডেট ভাবনা জয়াকে বাধা দেয়। সমাজকে চিনতে পারে জয়া—

> " কি আশ্চর্য দ্যাখো, একটা মানুষ শুধু তার নিজের কথা বলতে চায়, অথচ এই সমাজ, সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে, যেন কিছুতেই সে তার নিজের কথা বলে না। একটা মানুষকে কেউই বুঝি তার নিজের কথা বলতে দিতে চায় না। 'আমি' হয়ে উঠতে দিতে চায় না।"

রমাপদ মধ্যবিত্তের Conservative মানসিকতা যেমন দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় যে নারীত্বেই সেই পরিচয়টিও দিয়েছেন। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলতে গেলে নারীদের নিজেকেই এগিয়ে আসতে হবে। তবেই মধ্যবিত্ত সমাজ আধুনিক সমাজে পরিণত হবে।

'অহঙ্কার' উপন্যাস সম্পর্কে রমাপদ বলেছেন—

> " সিনেমা বা টিভিতে মুখ দেখানোর নেশা আজ মধ্যবিত্তকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু আপত্তি সেখানে নয়। এই অদ্ভুত প্রতিযোগিতা কেমন ভাবে পুরনো মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা সাধারণ সুখী পরিবারগুলিকেও প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য করে এবং শেষে হতাশার মধ্যে ডুবে যেতে হয় তা আমরা হামেশাই দেখতে পাই। পাশের বাড়ির ফাস্ট হওয়া ছেলেটি এখন আর কোনো আলোড়ন তোলে না। পাড়ার যে মেয়েটির মুখ টিভি-তে দেখা গেছে তার কথাই শোনা যায় মুখে মুখে। এই অবক্ষয়ের চিত্রটুকুই আঁকতে চেয়েছি।"[৩]

কিন্তু ১৯৯০-এ প্রকাশিত 'অহঙ্কার' উপন্যাসটির এই ভাবনা ২৯ বছর পর আজ ২০১৯-এ অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। আজ পাশের বাড়ির ফাস্ট হওয়া ছেলেটি বা টিভিতে মুখ দেখতে পাওয়া পাশের বাড়ির মেয়েটি কেউই তেমন কোনো আলোড়ন তোলে না। আর সিনেমা জগৎ সম্পর্কেও একটা স্বচ্ছ ও ভালো ধারণা মধ্যবিত্ত সমাজে তৈরি হয়েছে। কিন্তু নায়িকা মানেই যে একটা দৈহিক চাহিদা সেই ধারণা এখনও আছে শুধু মধ্যবিত্ত নয় সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে। এই প্রভাবটা এই উপন্যাসে দেখা যায়। এছাড়াও ব্যাকডেটেড ভাবনা এবং মধ্যবিত্তের আর কিছু স্তর হল—

এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে মানুষ আধুনিক হতে হতে চলছে। সুকমল-কল্যানী-পূণ্য এবং ঋতা এই চারজনকে নিয়ে তৈরি এক মধ্যবিত্ত পরিবার। যেখানে সুকমলের পিতার বসার ঘর বলে যে একটা ঘর হয় সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। তিনি তার সমস্ত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ এলে তাদের শোয়ার ঘরেই নিয়ে বসাত যা সুকমলের কাছে বিরক্তিকর ছিল। সেখানে সুকমল একটা বসার ঘর তৈরি করে। সুকমলের স্ত্রী কল্যাণী মাথায় ঘোমটা দিত না যা নিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে একপ্রকার ঠান্ডা লড়াই চলত। মেয়ে ঋতার শালোয়ার-কিমিজ, জিন্স পরার ইচ্ছাকে সে পূরণ করে। কিন্তু ঋতা কো-এড কলেজে পড়তে চাইলে কল্যাণী অনুমতি দেয় না। ঋতার কথায়—

> "আসলে সকলেই ভিতরে ভিতরে সেই ঠাকুমার যুগে পড়ে আছে। দু'পা এগিয়েই থেমে পড়ে। তারপরই ভয়, গেল গেল ভাব।"

পরবর্তী সময়ে ঋতার কাছে সিনেমায় নায়িকার রোলে অফার আসলে সুকমল রাগে কাঁপতে থাকে, নিজেকে ছোট বলে মনে করে। কারণ তাদের ধারণায় সিনেমাতে অভিনয় করা মানেই শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখানো। সুকমল নিজে বিভিন্ন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রশংসা করে, কিন্তু নিজের মেয়েকে সেই পর্যায়ে দেখতে চায় না সমাজকে বেশি মানে। বলে। সুকমলের ভাবনায়—

"সমাজ মানে তো শুধুই ইউনিফর্মিটি। সবাই যা করছে তাই করো, সবাই যা

পড়ছে তাই পড়ো। তা হলেই তুমি ভাল। প্রকৃত যুদ্ধটা তা থেকে আলাদা হতে চাওয়া, পৃথক হতে চাওয়া। তুমি যদি বেশি পিছিয়ে পড়ো তুমি একা, তুমি যদি বেশি এগিয়ে যাও তা হলেও তুমি একা।"

সুতরাং সমাজকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় সুকমলের মতো মধ্যবিত্ত মানুষেরা জাঁতার দুটো চাকির মাঝখানে পড়ে যন্ত্রণা পেতে থাকে। মধ্যবিত্তদের ধারণা ছোট ছোট পোশাক পরে স্ক্রীপটা মুখস্থ করে ক্যামেরার সামনে বললেই নায়িকা হওয়া যায়। কিন্তু অভিনয় যে একটা শিক্ষার বিষয়, অভিনেত্রী হয়ে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছতে গেলে নিজেকে যে অনেক পরিশ্রমী হতে হয় সেই ধারণাটি সুকমলের আসে তারই সম্প্রদায়ে থাকা তার বন্ধু নির্মলেন্দু যখন মধ্যবিত্তের গন্ডি পেরিয়ে উঁচু স্তরে উঠে যায় এবং তার মেয়ে রিঙ্কুও সিরিয়ালের নায়িকা হয়ে অনেক প্রসংশা পায়, তখন সুকমলের ধারণায় আসে—

"সমাজ মানে তা হলে ইউনিফর্মিটি। আর কিছুই নয়। এক নিয়ম এক নীতি মেনে চলা। সকলেই মেনে চলে, মেনে চলার চেষ্টা করে। আর তারই মধ্যে থেকে এক একজন বেরিয়ে আসে। তারা ব্যক্তি। ইনডিভিজুয়াল। তারা ভাঙে, বদলায়, বদলে যায়। ক্রমাগত এ দুইয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। একটা দ্বৈরথ যুদ্ধ। আর ধীরে ধীরে সমাজ কেমন বদলে যাচ্ছে।"

তাই সমাজ বদলানো ও নিজেকে বদলানোর ইচ্ছায় সুকমল ঋতাকে অভিনয় করার অনুমতি দেয়।

তবে এরই মধ্যে লেখক মধ্যবিত্ত মানসিকতার আর একটি যে দিক দেখিয়েছেন তা হল— মধ্যবিত্তরা মোটামুটি খেয়ে প'রে স্বচ্ছলভাবে সারাজীবন চললেই সন্তুষ্ট থাকে। চেষ্টা করলে যে এর থেকেও উন্নতি করতে পারে সেটার প্রতি ততটা গুরুত্ব দেয় না। তাই যা আছে সেটুকুর সন্তুষ্টি নিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে একটা অহঙ্কারকেও নিয়ে চলে। সেকারণে নতুনত্ব কিছুকে তারা সহজেই গ্রহণ করতে পারে না। আর তাদের গন্ডি থেকে কেউ এগিয়ে গেলে তার প্রতি ঈর্ষা জেগে ওঠে। সুকমলের সঙ্গে কম মাইনের সরকারি চাকরি ছেড়ে বেশি মাইনের বেসরকারি চাকরি করে নির্মলেন্দু ধনী হলে সুকমলের তাতে হিংসা না হলেও ঈর্ষাবোধ জন্মায় এবং নিজের পরিণতিতে লজ্জা পেয়ে নিজেকেও সেই স্তরে ভাবার ইচ্ছে হতে থাকে। নির্মলেন্দুর মতো নিজেদের কালচার্ড ফ্যামিলি, স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলি বানাতে চায়। এই প্রতিযোগিতার ফল অনেক সময় রেষারেষিতে পৌঁছায়, অনেক সময় হতাশায় পরিণত হয়। ঋতাকে অভিনয়ের অনুমতি দিয়ে সুকমলের পরিবার ভেবেছিল রিঙ্কুর চেয়ে ঋতা সুন্দরী হওয়ায়, তাদের বাড়ির উপর যেচে আসা সিনেমার অফার পাওয়ায় ঋতা রিঙ্কুর চেয়েও অনেক বেশি নাম করবে, অনেক এগিয়ে যাবে। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় ক্যামেরায় ঋতার ফেস আসেনি, গলার স্বরটাও না। তখন সুকমলের মুখে শুনতে পাই সেই হতাশার সুর—

"কাঁপা কাঁপা গলাতেই বলে, একটা বিশাল অহঙ্কার ছিল। আত্মসম্মানের অহঙ্কার। তাড়িয়ে

দিয়েছিলাম। টাকার লোভ দেখাচ্ছে বলে রেগে গিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এসব আমাদের পরিবারে চলে না।

সুকমলের চোখে বোধহয় জল এসে গেল। বলে, সেই অহঙ্কারটাও চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেল, ছোট্ট একটা গর্বের পিছনে ছুটতে গিয়ে সামান্য একটু লোভের জন্যে।''

এখানে মধ্যবিত্তমানসিকতার আর একটি দিক দেখা যায়— তা হল মধ্যবিত্তরা নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় সামান্য কিছু সুযোগ পেলে সেটা নিয়ে অতিরিক্ত স্বপ্ন দেখে ফেলে বা গর্ব করে। কিন্তু বাস্তব অতো সহজ নয়। তাই স্বপ্ন তাসের ঘরের মতন ভেঙে গেলে তারা ক্রমাগত অনগ্রসরতার পঙ্কিলতায় ডুবতে থাকে। আর সেই সঙ্গে আত্মসম্মানকে বড় বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় আরও বেশি হতাশার মধ্যে ডুবে যায়। রমাপদ চৌধুরী বিভিন্ন কারণ নিয়ে মধ্যবিত্তের জীবনসংকট দেখিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায়, স্বাধীনতা-প্রাপ্তি মুহূর্তে তরুণ লেখকদের কাছে স্বাধীনতা আসে বিবর্ণ অনুজ্জ্বল ধূসর দিনের ইঙ্গিত নিয়ে।

'' ভারসাম্যের বিচলন,.... সুস্থ জীবনবোধের অবসান, অবক্ষয়ের প্রতিষ্ঠা, ... স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষ বাংলার অর্থনৈতিক রাজনীতিক মহিমার অবসান: এই পটভূমিতে আলোচ্যমান লেখকেরা চোখ মেলে তাকিয়েছেন, দেখেছেন ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি, অবাক মেনেছেন ভাগ্যের পদাঘাত।''[৪]

এই গোষ্ঠীভূক্ত লেখকদের মধ্যে রমাপদ অন্যতম। আদর্শবাদের অবসান হতাশা প্রভৃতি তাঁর লেখায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি ''জীবনের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস''[৫] কেও রেখেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। উপন্যাস সমগ্র, রমাপদ চৌধুরী প্রথম খন্ড। (আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮৫) প্রসঙ্গ কথা, পৃষ্ঠা ৪৩৩।

২। পূর্বোক্ত, প্রসঙ্গ কথা, পৃষ্ঠা ৪৩৩

৩। উপন্যাস সমগ্র, রমাপদ চৌধুরী ষষ্ঠ খন্ড। প্রসঙ্গ কথা, পৃষ্ঠা ৫০৩।

৪। 'কালের পুত্তলিকা', অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

৫। রমাপদ চৌধুরীর 'হৃদয়' উপন্যাস সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তি।

ম হু য়া ভ ট্টা চা র্য্য

রমাপদ চৌধুরী ও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনালোক

আধুনিক কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র, মৌলিক কথাকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক লেখক রমাপদ চৌধুরী এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। কারণ তিনি ছিলেন আত্মমগ্ন সাহিত্যের ছাত্র, সংযত বাস্তবতাসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পাঠক। তারপরে নিরপেক্ষ শিল্পবোধসম্পন্ন এক পরিপূর্ণ লেখক। তিনি ১৯২২ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা শ্রী তারাপ্রসন্ন চৌধুরী ভারতীয় রেলের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর দাদামহাশয় খড়গপুরের প্রথম রেলওয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই স্কুলেই তাঁর পড়াশোনার প্রথম পদক্ষেপ। তাঁর আদর্শমান পিতা, নিজে বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও পুত্র রমাপদের সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াননি। তাই স্কুলের পড়া শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজি সাহিত্যে এম.এ. পাস করেন। এরপর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম চাকরি। দেশ পত্রিকা ও আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি সম্পাদনার কাজে রত ছিলেন। অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগের সম্পাদনা করতেন। তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও গুণী সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'Life of India' 'রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা' ও 'ইদানিং' নামে তিনটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এই তিনটি পত্রিকার মধ্যে ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাবে 'ইদানিং' পত্রিকাটি আড়াই বছর ও 'রমাপদ চৌধুরীর পত্রিকা'টি ছয়মাস মতো চলেছিল। তাঁর প্রিয় কবি জীবনানন্দ দাশ, যিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান অনুপ্রেরণায় ছিলেন। কবি জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থ লেখক রমাপদ চৌধুরীর লেখক হয়ে ওঠার বিশেষ অনুপ্রেরণা। তিনি তাঁর প্রিয় কবির মতোই নিঃসঙ্গতার শিকার ছিলেন। তার এই নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, ভীতি সব মিলেমিশে তাকে একজন নিঃসঙ্গ সাহিত্য সাধানার একনিষ্ঠ লেখক বা সাহিত্যিক করে তুলেছিল।

রমাপদ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যকর্মে দুটি পর্বের অবতারণা করেছেন। প্রথম পর্বটির সবটা জুড়ে তার জন্মস্থান খড়গপুর ও ভারতীয় রেলের সঙ্গে যুক্ত জীবন অভিজ্ঞতা প্রাধান্য পেয়েছে। এই পর্বের নামকরণ করেছিলেন বৈচিত্র পর্ব। এই পর্বে বন্ধুদের

অনুরোধে লেখা তাঁর প্রথম গল্প 'ট্র্যাজেডি ১৯৩৭" লিখেছিলেন। কিন্তু তখনও তার মধ্যে গল্প-উপন্যাস লেখার নেশা সেভাবে বাসা বাঁধেনি। কারণ তখন যে খিদে অসম্ভবরকমভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তা হল— পড়ার খিদে। নতুন-পুরোনো যে কোনো বই পেলেই তিনি গোগ্রাসে পড়ে ফেলতেন। বানার্ড শ, টলস্টয়, ইবসেন, রমা রল্যা তাকে উন্মনা করে তুলত। কারণ সেই সময় ছিল যুদ্ধের সময়। এই যুদ্ধের বাজারে বিনামূল্যে সৈন্যদের দেওয়ার জন্য পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হত। এই অজস্র নামি-দামি বই প্রায় বিনামূল্য অন্যান্য দেশের মতো কলকাতার নিউমার্কেট অঞ্চলের ফুটপাতে সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল। বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে এই পরিচয় তাঁকে তাঁর শিল্পবোধের সঙ্গে অসাধারণভাবে সম্পর্কিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায় "আসলে লেখক তো হয়েছি পাঠক ছিলাম বলে।" তাঁর উপন্যাসের ভিত হ'ল জীবন অভিজ্ঞতা। ১৩৫০ থেকে ১৩৬১ (উদয়াস্ত' থেকে 'ঝুমরা বিবির মেলা') তাঁর লেখা প্রথম দিকের ছোটগল্পগুলিই শিল্পবোবাধসম্পন্ন মনোবৃত্তির প্রকাশক। পরিণত দক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গিতে, মগ্ন আত্মানুসন্ধান তার শিল্পীসত্তাকে, জীবনরসসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিঃসরণে, অত্যন্ত সহজ সরলতার সঙ্গে সহায়তা করেছে। ফলে সুন্দরবনের 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ', 'আদিম অরণ্য', 'বনপলাশির পদাবলী' আবার ইতিহাস সমৃদ্ধ বিষ্ণুপুর ঘরানার 'লালবই-এর দরবার' অসাধারণ ভাবনাচরণের অভিনবত্বে ও মননশীলতার আত্মদর্শনে সক্ষম পদক্ষেপ রাখতে পেরেছে। তাঁর যথার্থ আত্মদর্শনই তাঁকে এক পরিপূর্ণ সাহিত্যিকের মর্যাদা অর্জনে সক্ষম করেছে। প্রকৃত আত্মদর্শন মানুষকে ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, অসহায়তার উর্ধে উঠতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজ পরিবর্তিত হয় কিন্তু সাহিত্য অপরিবর্তিত থাকে। আত্মদর্শন ও সমাজদর্শন একত্রে যে শিল্পকর্মটি সমাধান করে থাকে সেই শিল্পকর্মটিকে উৎকর্ষতায় যখন শিল্পোত্তীর্ণ হয় তখন জন্ম হয় প্রকৃত সাহিত্যের। আর এই সাহিত্যের জন্মদাতাই হলেন প্রকৃত সাহিত্যিক। রমাপদ চৌধুরীর লেখার প্রতি সততা ও নিষ্ঠাই তাঁকে উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনাতে অত্যন্ত উচ্চমার্গের সাহিত্যিকে পরিণত করেছিল, যদিও তিনি ছোটগল্প লেখাকেই 'উচ্চস্তরের শিল্প' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর লেখা উপন্যাস 'খারিজ', 'বীজ, 'বাহিরি', 'ছাদ', 'শেষের সীমানা' ইত্যাদিতে জীবন ও সাহিত্য মিলেমিশে এক হয়ে এক সমৃদ্ধ চিন্তনের পরিণত ছবি হয়ে উঠেছে। 'এখনই', 'আশ্রয়'— এই উপন্যাসগুলিতে মানবতার প্রতিমূর্তি রূপে এক একটি বিশেষ চরিত্রের অবতারণা করেছেন, যে চরিত্রটি সম্পূর্ণ উপন্যাসে এক সদর্থক চরিত্র হয়ে মানবিক দিকের সঙ্গে মানুষ বা পাঠককে পরিচিত করাচ্ছে। 'পিকনিক', 'লজ্জা', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিতে সম্পর্কের বিভ্রম, সম্পর্কের সান্নিধ্য, সম্পর্কের হত্যা, সম্পর্কের আবিষ্কার এই সত্যগুলির মগ্ন অনুসন্ধান সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর কাছে চিরকালীন তপস্যা হয়ে উঠেছে। তাঁর সততার দায়বদ্ধতা। তাঁর লেখনীকে বিষয় নির্বাচনে স্পর্শকাতর করে তুলেছে।

১৯৪৩-৪৪ সালে গল্পকার রমাপদ চৌধুরী গল্পকার জীবনের শুরু হয়, ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যে তিনি প্রায় উনচল্লিশটি গল্পর রচনা করেছেন, ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৮৫-৮৬ পর্যন্ত প্রায় পঁচাত্তরটি গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে উঠে এসেছে ব্যক্তিগত জীবনযাপনের নানা অভিজ্ঞতামোড়া জগৎ খড়গপুর রেল-কলোনী, আদিবাসীদের অঞ্চল আবার মধ্যবিত্ত শহুরে শ্রেণির জীবনবৃত্তান্ত। ১৯৬৭-৬৮ সালে লেখা 'আলমাটিরা' ১৯৭২-৭৩ সালে লেখা 'ফ্রীজ', ১৯৬৯-১৯৭০ সালে লেখা 'ডাইনিং টেবিল', একই বছরে লেখা 'ড্রেসিং টেবিল', এই গল্পগুলিতে বিষয়গত ধরন— সহজ সরল এবং প্রত্যক্ষ গবেষণামূলক জীবন উপাদানে নির্মিত জীবনবোধ। সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর প্রতিটি গল্পই স্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতায় অবগাহন করেছে। ফলে কোনো গল্পেই একই বার্তা বা বিষয়ের পুনরুক্তি কখনোই হয়নি।

স্বাধীনতার পূর্ববর্তী, স্বাধীনতার পরবর্তী, সাতচল্লিশের বঙ্গবিভাজন, না দেশভাগের গল্প, শরণার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, মানুষের ক্লীবত্ব, মনুষ্যত্বের স্খলন, যন্ত্রণা, সামাজিক পতন সমস্ত কিছুকেই বাস্তবতার নিরিখে, বাস্তবিক সত্যকেই ব্যক্তিগত কথনের পোশাকে সজ্জিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরার অভাবনীয় সাহিত্যসৃষ্টি তার সৃজনশীলতার হস্তাক্ষর হয়ে উঠেছে। তাঁর 'করুণাকন্যা' ও 'অঙ্গপালি' গল্পদুটিতে দেশভাগের পরে মানুষের মানবিক ইপ্সাগুলির নির্মমভাবে হত্যার আখ্যান পাওয়া যায়। নারীর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই, সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয়ের অসাধারণ শিল্পিত রূপ তাঁর লেখনিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছোটগল্প মানুষের বোধকে স্পর্শ করার এক অনন্য উপায়। সমাজের নানান স্তরের মানুষের নানান বাস্তবিক পরিস্থিতিতে অবস্থান, বিচ্যুতি, কর্মক্লান্তি, প্রেম, বিশ্বাস, আনন্দ ও সুখহীন জীবনের উদয়াস্ত, বাস্তব কাঠিন্যের দাঁড়িপাল্লায় সততা, স্বচ্ছতা, সহজ, সরলতার বাটখারায় একদম সঠিক মাপের চিত্রাঙ্কনে এঁকেছেন বারবার। পরিবর্তিত সময়ের ইতিহাস মানুষটিকে নিজের নিয়মে অগ্রসর করে থাকে। সেই সম্পূর্ণ পরিপূর্ণতার বাস্তবচিত্র লেখক রমাপদ চৌধুরীর লেখনি পাঠককে বারবার উপহার দিয়েছে।

রমাপদ চৌধুরী সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভের গল্পরচনার নাম 'উদয়াস্ত'। এরপরে পূর্বাশায় প্রথমে বিনা পারিশ্রমিক ও পরে মাত্র পনেরো টাকা পারিশ্রমিকে তাঁর সাহিত্যের জয়যাত্রার পদক্ষেপ। চতুরঙ্গ ত্রৈমাসিকে চল্লিশ টাকা সম্মান-দক্ষিণার বিনিময়ে, তাঁর লেখনি, গল্পে সাহিত্যের জীবন-যাপন বাঁধানো। তার প্রথম উপন্যাস হ'ল 'প্রথম প্রহর'। এরপরে নানান উপন্যাসের পাতায় পাতায় জীবন উপস্থিত হয়েছে জীবন্ত হয়ে। তাঁর উপন্যাসগুলি উপলব্ধিতে দৃঢ়, বজ্রমুষ্ঠি হয়ে এক একটি জীবনসত্যকে ঋজুতার বাহুবেষ্টনে বন্দী করে মিতকথনের দ্বারা মানুষের গ্রামকেন্দ্রিক, শহরকেন্দ্রিক ও শ্রেণিকেন্দ্রিক জীবন তুলে ধরেছে অনায়াস পদ্ধতিতে। লেখক এই উপন্যাস রচনার

পদ্ধতির নাম দিয়েছিলেন 'মিত তরঙ্গ রীতি'। তিনি নিজস্ব নাম ছাড়াও আরও দুই ছদ্মনামে জ্যোতিষ সম্পর্কে কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। সেই ছদ্মনাম দুটি হ'ল- 'পত্রনবীশ' ও 'অর্জুন রায়'। লেখক রমাপদ চৌধুরীর লেখা 'কালামাটি' ও 'এখনই'-কে চলচিত্রায়িত করেছেন তপন সিংহ। চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন তাঁর লেখা 'খারিজ'কে চলচ্চিত্ররূপে দান করেছেন। 'বীজ' উপন্যাসকেও শ্রী সেন 'একদিন অচানক' নামে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ', 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস', 'বনপলাশির পদাবলী' ও চলচিত্রায়িত হয়েছে যথাক্রমে গুরু বাগচী, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমারের পরিচালনায়। 'অভিমন্যু' উপন্যাসকে পরিচালক তপন সিংহ হিন্দিতে 'এক ডাক্তার কি মওত' নামে চলচ্চিত্রায়িত করেন। যেখানে দাঁড়িয়ে 'অগ্রগামী' চলচ্চিত্রায়িত করেছিল। দূরদর্শনেও তার প্রচুর লেখাকে তুলে ধরেছেন মৃণাল সেন, গৌতম ঘোষ, সলিল চৌধুরী।

সাহিত্যজীবনের সার্থকতার অনেক পুরস্কার সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী পেয়েছেন। যদিও তিনি আত্মপ্রচার বিমুখ সাহিত্যিক ছিলেন। ১৯৬৩ সালে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭১ সালে 'এখনই' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৪ সালে শরৎশ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার ও পদক পেয়েছিলেন। ১৯৮৭ তে তাঁকে 'জগত্তারিণী পদক' পুরস্কার দেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৮ সালে 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসের জন্য তিনি সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার পান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'গল্প-সমগ্র' গ্রন্থটির জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করে। ১৯৯৫ তে শরৎ সমিতির শরৎচন্দ্র পুরস্কার পান। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯ সালে লেখা রমাপদ চৌধুরীকে সাম্মানিক ডি. লিট প্রদান করেন।

তাঁর পঞ্চাশের বেশি উপন্যাস, প্রায় দেড়শো ছোটগল্পের সাহিত্য সম্ভার তাকে পাঠক মানসে অমরত্ব দান করেছে। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর অসাধারণ সম্পাদনায় তিনি অনেক নবীন সাহিত্য প্রতিভাকে সাহিত্যঅঙ্গনে তুলে ধরেছেন। নিরহঙ্কার এই মানুষটি বাইরে রাসভারী স্বভাবের হলেও অন্তরে ছিলেন অন্যস্বভাবের। তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি জীবনবোধসম্পন্ন এক যথার্থ সমৃদ্ধ সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সম্পাদক ছিলেন। আত্মানুসন্ধান সাহিত্য জগতে তাঁকে এক স্বতন্ত্র স্থান করে দিয়েছে। পাঠকের হৃদয়ে সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী তাই একটি বিশেষ মুগ্ধতা সৃষ্টিতে অনন্য সাহিত্য ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন।

বয়সে অনুজ হলেও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমকালীন কথাসাহিত্যিক ধারায় এক স্বতন্ত্র আলোকোজ্জ্বল প্রতিভা। অগ্রহের পরে পরেই এই মরমী সাহিত্যিকের জীবনাবসান ঘটে। প্রসঙ্গত তিনিও এখানে আলোচ্য। সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪১ সালের

বাইশে কার্তিক মধ্যরাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবার নাম অভিমন্যু ভৌমিক ও মায়ের নাম লাবণ্যপ্রভা। আসলে লেখকের পূর্বপুরুষ মণিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় বারো ভূঁইয়ার এক ভূঁইয়া নবাব ঈশা খাঁর দেওয়ান হয়েছিলেন বলে তাঁকে ভূঁইয়া উপাধি দান করা হয়েছিল। এই মণিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় সাগ্রহে সেই ভুঁইয়া উপাধি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু লেখকের জ্যাঠামশাই দেশভাগের সময়ে লেখকের নাম অতীন্দ্রশেখর ভৌমিকের স্থানে অতীন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় করে দিয়েছিলেন। সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা ছিলেন উদাসী, সরল ও অতিমাত্রায় ঈশ্বরবিশ্বাসী। সেই ঈশ্বর খোঁজেই ১৯৪৯ সালের মে মাস নাগাদ লেখক প্রথমবার নিরুদ্দেশ হলেন। এই নিরুদিষ্ট থাকাকালীন অবস্থাতেই একটু আশ্রয়, খাবার আর উত্তাপের খোঁজে এবং সঙ্গে ঈশ্বর অনুসন্ধানের কারণে নানা জায়গায় নানান ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসার জন্য তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ হতে থাকল। বাড়িতে এসে বাবাকে জানাতেন ঈশ্বরকে না পাওয়ার কথা। বাবা তাকে সান্ত্বনা দিতেন— "অধীর হলে হবে না। সময় হলেই হবে"। এভাবেই এর মধ্যেই পড়াশোনার ক্ষেত্রেও অগ্রসর হওয়া। দু-দুটো পাসের অধিকারী হওয়া। ১৯৫২ সালে আবার নিরুদ্দেশ হন। শেষ পর্যন্ত হালিশহরে ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল কোর্সে যোগদান করে ট্রেনিং শেষে জাহাজে কোলবয়ের চাকরি নিয়ে দেশে-বিদেশে কাটানো। এভাবেই তিনি জীবন বয়ে যাওয়ার ছন্দে আবিষ্কার করলেন পৃথিবী, জীবন, ঈশ্বরের পাশাপাশি অবস্থান। জীবনই ঈশ্বরের উপস্থিতির কারণ। জীবন নির্ভর করে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ওপর। অর্থাৎ এই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানই তার কাছে হয়ে উঠল ঈশ্বর। আবিস্কার করলেন ভূতভীতির মতো কাল্পনিক ঈশ্বরভীতি ও মানুষকে স্বাধীন চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে পঙ্গু করে দেয়। এ প্রসঙ্গে 'কালের যাত্রা রূপক মাত্র' গল্পে তিনি মানুষের মৃত্যুকে নতুন নামকরণ করলেন— কালের যাত্রা অতিক্রম করা'। কারণ মৃত্যুর প্রসঙ্গ, মানুষের সাথে ঈশ্বরের সহমরণে যাওয়াকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। জীবনের প্রকৃত ধর্ম লেখকের মতে— ঈশ্বর, বিধিলিপি, ভাগ্য ইত্যাদির সাহায্য ছাড়াই কালের যাত্রাকে অতিক্রম করে যাওয়া। মানুষ নিজেই নিজের ঈশ্বর। মানুষের সাথে মানুষের ভেদাভেদ, স্বার্থ, লোভ, হিংসার প্রাচীর তুলে মানুষের মানুষকে অসম্মান করা— স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে, এটাই পাপ, এটাই দুর্বলতা মানুষের। লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুভব করেছিলেন নিয়মকানুন, শৃঙ্খলাবোধের হাত ধরে মানুষ অতি সহজেই মানুষ, মানুষের জন্য মানুষের সমৃদ্ধি ও ভালোবাসার পৃথিবী তৈরি করতে সক্ষম, কারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস মানুষকে সব পাবার পৃথিবী উপহার দিতে পারে। মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে ঈশ্বরবাদের বিশালতাও হার মানে। ক্ষীণ হয়ে যায়। মানুষের প্রতি লেখকের এই আত্মবিশ্বাসই তাঁকে গল্প, উপন্যাস লেখাতে উদ্বুদ্ধ করে।

সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ঢাকা জেলার রাইনাদি

গ্রামে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি দেশভাগের কিছুদিন পরে এদেশে এসেছিলেন। তিনি ম্যাট্রিকের টেস্ট পরীক্ষা ওপারে দিয়ে ফাইনাল এপারে দিয়েছিলেন। তখন দুই বাংলার মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তাঁরা এদেশে মুর্শিদাবাদে খানিকটা জঙ্গলজমি কিনে বসবাসের চেষ্টা করেছিলেন। এভাবে জঙ্গল কেটে বাসস্থান নির্মাণের মতো কঠিন জীবনযুদ্ধের কাহিনী তিনি 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। দেশত্যাগের যন্ত্রণার কথা, তাঁর শৈশব-কৈশোরের সব হারানোর গল্প বারংবার নানান সাহিত্য সৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের দুই পর্বে ও পরবর্তী 'অলৌকিক জলযান' ও 'ঈশ্বরের বাগান' খণ্ডগুলিতে তিনি যথাযথভাবে দেশত্যাগের মনোবেদনাকে রূপ দিয়েছেন। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেক চরিত্রই জীবনের অপ্রাপ্তি হয়ে উঠেছে এক জীবন যন্ত্রণার জীবন-বোধ।

সাহিত্যিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়মাপের উপন্যাসগুলিতে বাঙালির আর্থ-সামাজিক দিকটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা 'জনগণ' মানুষের জীবনাশ্রয়ী এক জীবনবেদ হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র মিহির সান্যালের জীবনের আনন্দ-যন্ত্রণা, বাস্তুহারা হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার কাহিনীর সাথে লেখকের জীবনকাহিনী মিলেমিশে গেছে। ঠিক এভাবেই জাহাজের নাবিক, ট্রাকের ক্লিনার, প্রাথমিক শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, কারখানার ম্যানেজার, প্রকাশনা সংস্থার উপদেষ্টা ও সাংবাদিকতার মতো নানান বৃত্তি গ্রহণ করে দেশ-বিদেশের ধুলায় জীবনকে স্নান করিয়ে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন অভিজ্ঞতার ঝুলি। সেই অভিজ্ঞতার ঝুলিই জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসের। লেখক অতীনের গল্পের অন্যতম দিক হ'ল সময় সচেতনতা। চলমান সময়কে জীবনের অনিবার্য প্রকাশ রূপে তুলে ধরেছেন। যে সময়ের চলার পথের যবকিনা টানে মৃত্যু। 'শেষ দেখা', 'যথাযথ মৃত্যু' প্রভৃতি গল্পে সেই সময় সচেতন লেখককে আমরা পাই যিনি একই সাথে 'চোরাবালি' গল্পে আত্মহত্যার হপ্পা থেকে ফিরে আসা জীবনমুখী মানুষকে পরিচিত করিয়েছেন, ঠিক তেমনি আবার 'মানিকলালের জীবনচরিত' গল্পে তুলে ধরেছেন— মানুষ কখনও কখনও মৃত্যুকে জীবনের ইপ্সিত বস্তু মনে করে। সময়ের চলার অর্থই প্রতিটি মুহূর্তে বয়সের পদক্ষেপ। লেখকের আর একটি গল্পের নাম 'বয়স'। যে গল্পে লেখক অতীন অসাধারণ ব্যুৎপত্তিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বয়সের নানান রূপ। নানা বয়সে জীবন জাগে শরীরে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য সমস্তই, বয়সের স্বাক্ষর শরীরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের শাখা-প্রশাখা যেমন বিস্তার করে সংসারে, ঠিক তেমনি সময়ের থাবায় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বহু গল্পে দেখি অবহেলিত বার্ধক্যের কারণে অবহেলিত মানুষের মৃত্যুবরণ। এমনই একটি গল্প 'ফুলের

টব'। এই গল্পে জীবনমৃত্যুর মতোই যৌবনের শেষে বার্ধক্য অপেক্ষারত। সেই সময়টাতে সংসারের সকলের অবহেলার পাত্র বৃদ্ধের একমাত্র প্রিয়জন হয়ে ওঠে স্ত্রী। তবু মানুষ সম্পর্কের টানে বেঁচে থাকতে চায়। 'অন্নপূর্ণা' গল্পেও এই বার্ধক্যই বিষয় হয়ে উঠেছে। যেখানে সুন্দরী নাতবৌ নবযৌবনা সে, কিন্তু সর্বাঙ্গে ঘা, অস্থিচর্মসার দিদিশাশুড়িকে ঘৃণা করে। গল্পের শেষে লেখক দিদিশাশুড়ির যৌবনের ছবির সঙ্গে দিদিশাশুড়ির বার্ধক্যের ছবির তফাৎ অন্বেষণ করিয়ে একটি সহজ-সরল গল্পকে এক উচ্চতর দার্শনিকতায় উন্নীত করেন।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় যৌনতা ও এক আলাদা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে সমাজ সংঘবদ্ধতায়, মানুষের দায়িত্বশীলতার ভূমিকায় যৌনতা এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। লেখকের কাছে যৌনতা পূজাপাঠের দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা যা সন্তানজন্মের সূচনায় ব্যক্ত হয়। ফলে যৌনতার বর্ণনা বা ভাষাচয়ন বিষয়টিকে শ্লীল-অশ্লীলের বেড়াজাল পেরিয়ে করে তুলেছে জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ এক বিষয়, যা ঐশ্বরিক এক আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়। এই ভাবনায় জন্ম হয়— 'অলৌকিক জলযান'-এর মতো উপন্যাসের।

প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তিনি পাঠক সমাজে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি লিখে জনপ্রিয়তার শীর্ষ ছুঁয়েছিলেন। সমুদ্র ও সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া জাহাজের মানুষদের নিয়ে তিনি অনেক গল্প-উপন্যাসের জন্ম দিয়েছেন, কারণ তিনি নিজেই জাহাজের নাবিক ছিলেন। 'সাগর জলে', 'সমুদ্রে বুনো ফুলের গন্ধ', 'সাগরে মহাসাগরে', 'সমুদ্রযাত্রা', সমুদ্র ও তার জলবায়ু, 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান' এই আখ্যানগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা 'সমুদ্র মানুষ' মানিক স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেছিল।

লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোরদের জন্য যা লিখেছেন তা সমকালীন শিশু-কিশোর সাহিত্যের থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। তাঁর রচনায় রূপকথার পৃথিবী নয়, প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তব জগৎ, যাকে শিশু-কিশোরদের সামনে অত্যন্ত ব্যুৎপত্তিতার সঙ্গে তাদেরই মতো করে তুলে ধরেছেন। স্থান পেয়েছে বিভিন্ন অন্যায়ের প্রসঙ্গ ও তার সমাধানের উপায় হিসেবে মানবতার মন্ত্র। ছোটদের সরল মনে এই মানবতার বীজ একটা স্থায়ী মহীরুহ হয়ে উঠে শিশুকে মান-হুঁশ সম্পন্ন এক মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। তিনি শিশু ভোলানো গল্প-কাহিনী নয়, শিশু জাগানো গল্প-উপন্যাসে বাস্তব ও কল্পনাকে সমানুপাতে মিশিয়ে, ন্যায়-অন্যায়বোধসম্পন্ন এমন এক প্রকৃতি নির্ভর আখ্যান সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর একান্তই নিজস্ব ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ এবং যা শিশুদের ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করে জীবনযাপনের গভীরতায় নিহিত প্রত্যক্ষ কল্পনার সত্যকে উপলব্ধির মাধমে। এমনই, এক উপন্যাসের নাম—'বিন্নির খই লাল

বাতাসা।' এছাড়া 'উড়ন্ত তরবারি'ও কিশোর সাহিত্যের এক অসাধারণ সৃষ্টি। 'উড়ন্ত তরবারি' ছোটগল্পের সঙ্কলনে তিনটি ছোটগল্প বর্তমান। সেগুলি হল 'উড়ন্ত তরবারি', 'গুপ্তধনের গুপ্তকথা', ও 'হিরের চেয়েও দামি।' এই গল্পগুলিতে তিনি দেখিয়েছেন, স্নেহ-মায়া-মমতা-বাৎসল্যময় ভালোবাসা ছোটদের মনে এমন এক কল্পনার জগৎ গড়ে তোলে যার গোড়াতে থাকে বাস্তবের স্পর্শ।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য জীবনের অসাধারণ কৃতিত্বের কারণে নানা পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। ১৯৫৮ সালে 'উল্টোরথ' পত্রিকা আয়োজিত 'মানিক স্মৃতি' পুরস্কার, ১৯৯১ সালে পান 'বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কার'। ১৯৯৩ সালে 'পঞ্চযোগিনী' উপন্যাসের জন্য পান 'ভুয়ালকা পুরস্কার'। ১৯৯৮ সালে 'দুই ভারতবর্ষ' উপন্যাসের জন্য পান 'বঙ্কিম পুরস্কার'। ২০০১ সালে পান 'পঞ্চাশটি গল্প' সংকলনের জন্য। 'সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার' ২০০৫ সালে 'শরৎ পুরস্কারে' ভূষিত হন। ২০০৮ সালে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের জন্য পান 'সুরমা চৌধুরী মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ইন লিটারেচার অ্যাণ্ড জার্নালিজম' পুরস্কার, যার অর্থমূল্য ছিল দশ লক্ষ টাকা। ২০১৪ সালে পান 'সিরাজ আকাদেমি পুরস্কার'। এছাড়াও তিনি 'মতিলাল পুরস্কার', 'তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পুরস্কার', ও 'সুধা পুরস্কারে' সম্মানিত হয়েছেন।

তাঁর প্রথম লেখা গল্প হ'ল 'কার্ডিফের রাজপথ' যা তিনি প্রধানত বন্ধুদের আগ্রহেই লিখেছিলেন। আবার প্রথম উপন্যাস 'সমুদ্র মানুষ'ও তিনি লিখেছিলেন বন্ধুদের আগ্রহেই। এভাবেই তাঁর লেখক জীবনের শুরু। তারপর তাঁর নিজের ঘটনাবহুল জীবনের নানান চড়াই-উতরাই সৃষ্টি করেছে নানান গল্প উপন্যাস। তবে তাঁর নিজের কাছে তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হ'ল 'মানুষের ঘরবাড়ি।' এই উপন্যাস তাঁর বাবার এপার বাংলায় এসে বাড়ি-বসত বানানোর কাহিনির বর্ণনা যা, বেদনা-আনন্দ-ভালোবাসায় মাখামাখি এক জীবন্ত দলিল। তাঁর সারস্বত সাধনা জীবনের সংগ্রামমুখর মানুষের জীবনবেদ। সেজন্য তিনি চিরকালীন।

আকরগ্রন্থ ঃ

'রমাপদ চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের কথাকার', নিহারকান্তি মণ্ডল, কারুকথা এইসময়, কলকাতা, জুন-অক্টোবর ২০১৮

'রমাপদ চৌধুরী' আশিস ঘোষ, কারুকথা এইসময়, কলকাতা, জুন-অক্টোবর ২০১৮ 'রমাপদ চৌধুরী' : 'বৈচিত্র ও অনুসন্ধান', সম্পাদক— উত্তম পুরকাইত, উজাগর প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৯ 'হারানো খাতা', রমাপদ চৌধুরী, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫ 'গল্পসরণি—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা', সম্পাদক— অমর দে, প্রকাশক— তাপসী দে, কলকাতা, ২০১৬

প ঞ্চা ন ন ন স্ক র

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস: নোঙরহীন উদাস বিষাদ

এক

স্বাধীনতা উত্তর যুগের বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান স্থপতি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও সাজানো গোছানো ভাষা নয়, মানুষের জীবন্ত ভাষাকে অবলম্বন করে তিনি উপন্যাস— ছোটগল্পের নির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন : এক আশ্চর্য জগৎ, যেখানে গাছপালা, পোকা মাকড়, জীবজন্তু মিলেমিশে একাকার। ফলত বাংলা সাহিত্যে তাঁর শিকড় কেন্দ্রিক কৌম জীবন যেমন মনোমুগ্ধকর তেমনি তাঁর একান্ত নিজস্ব। যা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মৌলিকতারই অনন্য এক বীজক্ষেত্র। তাঁর সাহিত্যক্ষেত্র বহু বর্ণময় বিচ্ছুরণে আলোকিত। সমকালীন সময়, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিশ্বের পারিপার্শ্বিক অবস্থানগত বাস্তবতা পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি যে গল্প উপন্যাসগুলি লিখেছেন তা আদি-অন্তহীন এক অখন্ড কাহিনি, সে কাহিনি নস্টালজিয়ার বেদনায় স্পন্দিত।

দুই

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে মূলত উঠে এসেছে স্বাধীনতা, দেশভাগ, ছিন্নমূল মানুষের স্রোত, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম আর কালের হাওয়ায় বদলে যাওয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের অবক্ষয়িত মূল্যবোধের চিত্র। ছিন্নমূল মানুষের কথা আর তাদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা দেবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রফুল্ল রায়, অসীম রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনায়। এরই পাশাপাশি অনেক কথাসাহিত্যিক বঙ্কিম-অনুসৃত ইতিহাস ও ইতিহাস রসের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। শরদিন্দুর 'গৌড়মল্লার', 'তুঙ্গাভদ্রার তীরে', মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার', 'ঝাঁসির রাণি', সমরেশ বসুর 'উত্তরঙ্গ', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'শাহাজাদা দারাশুকো', রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ', শক্তিপদ রাজগুরুর 'মণিবেগম', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সেইসময়' যেন সেই দাবির ফসল। বিপরীতে ইতিহাসমিশ্রিত রোমান্সের পরিবর্তে জীবনের বাস্তব দিকটাই এ সময়ের লিখিয়েদের অনেক বেশি আকৃষ্ট করেছে। যেখানে বঙ্কিম কথিত আদর্শবাদ ও নীতিবাদ গৌণ, জীবনের দাবিটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এক সহজাত স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বস্তুতান্ত্রিক উপায়ে সাহিত্যে জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে

ধরেছেন, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবনার শরিক। সমগ্র গল্প উপন্যাস জুড়ে তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা রঙে রেখায় ভাষা পেয়েছে। স্মৃতির রেখায় ভেসে ওঠা ছবিগুলো সমাজ দেশ কালের এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত হয়েছে মায়াময় কবিত্বের বন্ধন ছিন্ন করে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞাতাকে সাহিত্যের পাতায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন বলে তাঁর ঘোষণা—

"আমার জীবনটা ঘটনাবহুল, বলতে পারো আমার জীবনটাই একটা উপন্যাস, যার প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে নানা ঘটনা। ঘটনাবহুল এই জীবনের কথাগুলোকে খানিকটা কল্পনার রঙে মিশিয়ে ব্যক্ত করেছি নানা রচনায়।... আর সত্যি কথা বলতে কী, আমি বানিয়ে লিখতেও পারিনা। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় হাত দিইনি।"

একজন মহৎ শিল্পী আত্মসচেতন, আত্মসচেতন বলেই পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা, ঘটনাক্রম সবকিছু সম্পর্কে তিনি সচেতন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উপন্যাস নিয়ে পাঠকের দরবারে হাজির হলেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ প্রভৃতি একের পর এক আঘাতে বাংলা ও বাঙালির জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, এরকম একটা সামাজিক অবস্থানে, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে আবির্ভাব। জীবনের সুবিপুল অভিজ্ঞতাকে নিরন্তর কথাসাহিত্যে বদ্ধ রেখেছেন, তবে সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেছে তাঁর দেশত্যাগের যন্ত্রণার কথা। এই বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় খুব বেশি কালজয়ী গল্প উপন্যাস লেখা হয়নি। কিন্তু অতীনের ট্রিলজি 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'অলৌকিক জলযান', এবং 'ঈশ্বরের বাগান' দেশভাগ জনিত সমস্যার এক অনবদ্য মানবিক দলিল। প্রয়াত সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতে, গুণমানে ও ব্যপ্তিতে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' বা বিখ্যাত গ্রীক ট্র্যাজেডির সঙ্গে তুলনীয়। দেশভাগের যন্ত্রণা তিনি যেভাবে মননে ধারণ করেছিলেন, তাঁর উপন্যাসের শরীরও সেই যন্ত্রণায় নীল। একটি সাক্ষাৎকারে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, " একজন লেখক তাঁর সম্প্রদায়ের হয়ে লিখতে পারেন না তাঁকে সবার হয়ে লিখতে হবে।"[২] বস্তুত তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তিনি নিরন্তর বিচরণ করে খুঁজতে চেয়েছেন জন্মভূমির পুকুর, নদী, খাল, বিল, চাষের জমি, গরু, কুকুর এবং অরোও অনেক কিছু। হারিয়ে ফেলা এই জীবনকে অতীন যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। এর সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি' 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান', 'জনগণ', 'সমুদ্র মানুষ' প্রভৃতি উপন্যাসে।

তিন

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪ সালে, ঢাকার রাইনাদি গ্রামে। শৈশব ও

কৈশোর কেটেছে সেখানেই। সাড়ে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত সেখানেই থাকার পর ছিন্নমূল হয়ে কলকাতায় এসে পড়েন। এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, "সেইসময় মুসলিম পড়শিরা তাঁদের দেশ ছেড়ে যেতে বারণ করেছিলেন। কারণ তাঁদের গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কখনও নষ্ট হয়নি।"[৩]

উদ্বাস্তু হওয়ার যন্ত্রণা অতীন সারাজীবন উপলব্ধি করেছেন মর্মে মর্মে। সারাজীবনের লেখায় ফিরে এসেছে ওই স্মৃতির ছোবল। নাবিক, ট্রাক ক্লিনার, স্কুল শিক্ষক, কারখানার ম্যানেজার থেকে সাংবাদিকতা বিচিত্র ছিল তাঁর পেশা জগৎ। কথিত, কবি শামসুর রাহমান তাঁকে বলেছিলেন যে, 'দেশ না ছেড়ে গেলে তুমি লেখক হতে পারবে না।'[৪]

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের খন্ডিত অথচ চিরন্তন এক অধ্যায়কে ধারণ করে আছে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'। উপন্যাসের আখ্যান শুরু হয়েছে দরিদ্র মুসলিম ঈশম শেখকে নিয়ে আর আখ্যান শেষও হয়েছে তাকে দিয়ে। পরাধীন ভারতে ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী হয়ে যে ঈশমের পায়ের তলায় জমি ছিল, পেটে অন্ন ছিল, মনিব বাড়ির ভালোবাসা ছিল, স্বাধীন পাকিস্তানে সেই ঈশম হয়েছিল সর্বহারা। প্রাণাধিক প্রিয় তরমুজ খেতেই দুই দিন মৃত অবস্থায় পড়েছিল ঈশম। অবশেষে সামসুদ্দিন সেখানেই তার কবর স্থাপন করে চিরশান্তি দেয় অতৃপ্ত ঈশম শেখকে। আবার তুচ্ছ এই মানুষকেই সামসুদ্দিন করে তোলে বাংলাদেশের প্রতিবিম্ব।

এই চিত্রকল্পের আড়ালে আছে দেশভাগের ব্যর্থতা। স্বাধীন পাকিস্তানের লক্ষ্যে দিনের পর দিন মুসলিম লিগের হয়ে কাজ করেছিল সামসুদ্দিন। কিন্তু স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম মুহূর্তেই স্বপ্নভঙ্গ ঘটল সামসুদ্দিনের। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল শাসকদল। সামসুদ্দিনের মতো বাংলাভাষী মানুষেরা এর প্রতিবাদ করতে থাকে প্রবলভাবে— "... সামু জানে চুপচাপ বসে থাকার সময় আর হাতে নেই। দেশের স্বাধীনতার পর আর এক সংগ্রাম গ্রামে মাঠে আরম্ভ হয়ে গেছে। যে দেখল জিন্নাহ সাহেব যখন বের হয়ে যাচ্চেন, তখন চারপাশ থেকে অযুত কণ্ঠে গলা মিলিয়ে কারা যেন বলছে, না না না। উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে না।"[৫] পুরাতন ভুল সংশোধন করে নতুন এক স্বপ্ন নির্মিত হল সামসুদ্দিনের হৃদয়ে। শুরু হয়েছিল বাংলাদেশের জন্ম প্রক্রিয়া বা নতুন নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে।

আলোচ্য উপন্যাসে গ্রাম্য জীবন, গ্রাম্য মানুষ আর প্রকৃতি গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ। হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি ভালাবাসা, সহানুভূতি আর সৌহার্দ্যের চিত্র অনুভূতিপ্রবণ লেখকের কলমের ডগায় মূর্ত হয়েছে। সেইসঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে হিন্দু মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের চালচিত্র। উপন্যাসটির অন্যতম

বিশেষত্ব হল, পূর্ববঙ্গের দরিদ্র মুসলিম সমাজের অন্তরঙ্গ জীবনবীক্ষার চিত্রায়ন। ঈশম, ফেলু, সামু, হাজিসাহেব, আন্নু, জালালি, জোটন, ফকিরসাব, মনজুর, ফতিমা, এর সকলেই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এদের দারিদ্র্য-পীড়িত জীবন সংগ্রামের পাশাপাশি হিন্দু সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা একটা বৈপরিত্যের জন্ম দিয়েছে—

"গ্রামের পর গ্রাম, বিস্তীর্ণ মাঠ, মুসলমানদের গ্রামগুলিতে হাহাকার যেন বেশি... আর হিন্দু গ্রামগুলির দিকে তাকাও পুবের বাড়ি যেন নরেন দাস— তার জমি আছে, তাঁতের ব্যবসা আছে। দীনবন্ধুর দুই তাঁত দুই বউ। সুখে আছে লোকটা।"[৬]

এই অপ্রাপ্তির জন্ম বুকে নিয়ে সকলে সারাজীবন ধরে ছুটে চলেছে নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে। এক অসীম অনন্তের প্রতি যাত্রা জীবনের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ধাবিত হয়েছে।—

"নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'র জগৎ অতীনের মানসিক জগৎ ও তার সাহিত্যের জগৎকে উদ্ভাসিত করেছে।... লেখকের প্রকাশ ক্ষমতা আর দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্বে এর দ্বিতীয় কোনো দোসর নেই।" [৭]

চার

'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের অন্বেষণ আরোও গভীরতর ব্যাপ্তি লাভ করেছে 'মানুষের ঘরবাড়ি' উপন্যাসে, তিন পর্বের এই উপন্যাস 'মানুষের ঘরবাড়ি', 'মৃন্ময়ী' এবং 'অন্নভোগ' একত্রে 'মানুষের ঘরবাড়ি' নামে অখন্ড সংস্করণ হিসেবে ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৪৮ খি— ১৯৫৩ খ্রি। এই সময়ের মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রে এসেছে বিপর্যয়। উপন্যাসের ঘটনাকাল লেখকদের বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ের ঘটনা, উপন্যাসের প্রথম অংশে বিলুর লেখাপড়া, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, বাড়ি থেকে পালিয়ে রহমানের সঙ্গে ট্রাকের খালাসির কাজ— সমস্তই ব্যক্তি অতীনের জীবনের সঙ্গে মিলে যায়, উপন্যাসের পটভূমি বহরমপুর থেকে বারো ক্রোশ দূরে এক নির্জন বনভূমি। প্রায় সমস্ত উপন্যাস জুড়ে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যেন জীবনের সন্ধানে ব্রতী হয়েছেন—

"আমার কৈশোর জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার মানুষজন এবং একজন ছিন্নমূল মানুষের ঘরবাড়ি বানানোর আন্তরিকতা আমায় তাড়া করতে থাকলে উপন্যাসটি লিখতে শুরু করি। আর আমি বিশ্বাস করি, সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম শর্ত হল স্রষ্টার জীবন ব্যাপী সন্ধান, তবেই সার্থক সেই উপন্যাস। ... সেই কোন অতীত থেকে এই ভূখন্ডে যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্ষণ, গৃহদাহ, ধর্মান্ধতা যে শুরু হয়েছিল, দেশভাগ তার আর একটি পরিণতিমাত্র। কিছুই থেমে থাকেনা জীবনকালের রূপকমাত্র এমনও মনে হয়। এবং এমন সব ভাবনা মাথায় কাজ করে বলেই জীবনের কথা লিখতে আগ্রহ বোধ করি। 'মানুষের ঘরবাড়ির দ্বিতীয় খন্ড 'মৃন্ময়ী' এবং তৃতীয় খন্ড 'অন্নভোগ' উপন্যাসের ও সৃষ্টি এইভাবে"। [৮]

অতীনের বর্ণময় দিনগুলির স্মৃতি ও দেশভাগের একরাশ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সাগর থেকে মাহাসাগরে ঘুরে বেড়িয়েছেন ' 'সুমুদ্র মানুষ' অতীন তাঁর 'অলৌকিক জলযান'-এ চড়ে। এই উপন্যাসে জাহাজিদের কথা যেমন এসেছে তেমনি জাহাজের কথাও। শুধু ডাঙার পৃথিবী, সমাজ সংসার থেকে যে জাহাজিরা বিচ্ছিন্ন থাকে তা নয়; জাহাজের মধ্যেও অদ্ভুত এক বিচ্ছিন্নতা। লেখক ধীরে ধীরে উন্মোচন করছেন তার দীর্ঘ জাহাজবাসের অভিজ্ঞতা। শুধু আয়তনে বড় নয়, বিষয়ের অভিনবত্ব, গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে 'অলৌকিক জলজান' মহাকাব্যিক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। আসলে লেখকের জীবনটাই ঘটনাবহুল। তাঁর সাহিত্যিক হয়ে ওঠার উৎসেও আছে জীবন অভিজ্ঞতার প্রকাশ। একটি সাক্ষাৎকরে তিনি বলেছিলেন

"আমি যখন জাহাজ থেকে ফিরে এলাম তখন অনেক বন্ধুদের কাছে সেই দিনগুলো সম্পর্কে গল্প করতাম।... তারা কাগজ বের করত। আমাকে আমার জীবনের ঘটনা নিয়ে লিখতে বলত... তা থেকেই লেখা শুরু।"[৯]

ব্যক্তি অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের জীবন দর্শন এবং আত্মোপলব্ধির মিশ্রণে উপন্যাসটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে।

পাঁচ

'ঈশ্বরের বাগান' মহাকাব্যিক রচনা 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের শেষ পর্ব। উপন্যাসের সময়কাল (১৯৬৩-১৯৭১) স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মলগ্ন পর্যন্ত। চুরাশিটি পরিচ্ছদের বৃহৎ ক্যানভাসে জীবনের নানা ঘটনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাসের নায়ক অতীশ শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত। সমকালীন যুবা মানসের প্রতিনিধি হিসাবে অতীশ চরিত্রটি অঙ্কিত। এক বিশৃঙ্খল সমাজ পরিস্থিতিতে মূল্যবোধহীন দেশ-কালের জাঁতাকলে অতীশের জীবন ও দেশ সঙ্কটাপন্ন। নগর কলকাতার জীবনে সে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যাপৃত। প্রচন্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও অতীশ তার আদর্শবোধ ও সততাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেছে। যদিও কারখানার মালিক রাজেনবাবুর দুর্নীতি আর কৌশলী চালে সে পরাভূত। নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে লেখক কারখানার জীবন নগর সভ্যতার আপাত চাকচিক্যময় অথচ বিবর্ণ রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসের অতীশ আর লেখক অতীনের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। শৈশবের সোনা, কৈশোরের বিলু ও ছোটবাবু আর যৌবনের অতীশ লেখক অতীনের ব্যক্তিসত্তার পর্যায়ক্রমিক আবর্তন। তাঁর সমগ্র কথাসাহিত্য জুড়ে রয়েছে জীবন সম্পৃক্ত অভিজ্ঞতার বর্ণময় ছটা। জীবনের নানা পর্বের ঘটনাগুলিকে সাজিয়ে দিয়েছেন উপন্যাসের পাতায়। জীবনের বহুমাত্রিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত ও উপন্যাস আত্মচরিতের পরিবর্তে বিশুদ্ধ উপন্যাস হয়ে উঠেছে।

'জনগণ' উপন্যাসটি স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি জীবনের রূপান্তরের কাহিনি। নব্বইয়ের দশকের পটভভূমিতে কাহিনির ভিত্তি নির্মিত হলেও লেখক ফিরে গেছেন পঞ্চাশের দশকে, স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে বাঙালি জীবনে যে রূপবদল ঘটে যাচ্ছে 'জনগণ' উপন্যাসে তারই বিশ্বস্ত চিত্রায়ণে এক রহস্যময় জগতের সন্ধানে ব্যাপৃত। সোনা বিলু ছোটবাবু অতীশ দীপঙ্কর আজকে মিহির সান্যালে উত্তরণ ঘটেছে। অতীনের জীবনচর্যা এখানে মিলেমিশে একাকার—

"নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'মানুষের ঘরবাড়ি' প্রভৃতি উপন্যাসে যে জীবনটার কথা অনালোচিত রয়ে গেছে সে-কথা বলার তাগিদেই যেন অতীনের এই উপন্যাস রচনা, ফেলে আসা অতীত আর বর্তমান সময়ের গ্রন্থি বন্ধনে এ উপন্যাস হয়ে উঠেছে লেখক অতীনের আত্মতার পরিচয়বাহী।" [১০]

ছয়

মূলত বড়দের লেখক হিসেবেই অতীনের পরিচিতি। তবে কিশোরদের জন্য তিনি অবিস্মরণীয় সব লেখা লিখেছেন। যেখানে তিনি আর এক মানুষ। তাঁর যে গল্প উপন্যাসগুলি রয়েছে সেগুলো সমকালীন শিশু কিশোর রচনামালায় বেশ স্বতন্ত্র। তাঁর অনেক লেখার মধ্যেই চেনা জীবন আর কল্পনার জীবনের মেলামেশা অনায়াস ও স্বচ্ছন্দ্ব। কিন্তু তাঁর 'বিন্নির খই লাল বাতাসা' ও 'উড়ন্ত তরবারি' উপন্যাস দুটি নিছক কল্পনা নয়, কল্পকাহিনি-উপকথা-রূপকথার মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছে এক প্রেক্ষিত। যেখানে গল্পগুলোর মূল ধারার উপর বারে বারে আলো ফেলে, স্থান বিশেষের ইতিহাস, গ্রামীণ জীবন, ক্ষুধা ও দারিদ্যের সঙ্গে গরীব মানুষের সমঝোতা, লোককথা, প্রবাদ, অন্ধবিশ্বাস, তুকতাক, জড়িবুটি ইত্যাদি।

ছোটদের জন্য লিখতে গিয়ে অতীন বন্দ্যোপ্যাধ্যায় নেহাতই রূপকথার একটা পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, এমন কথা যদি ভাবা হয় সে ভাবনা ভুল। মানুষকে মর্যাদা দেওয়াতে তিনি বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর লেখায়। তাই কিশোরদের সামনে তাদেরই মত করে তিনি বাস্তবকে তুলে ধরেছেন। লেখকের কিশোর উপন্যাসের কাহিনির পটভূমি হিসাবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নাম করা হলেও ভৌগোলিক বেড়ায় তাই তাকে বাঁধা যাবে না, অনেকটাই ইচ্ছের জোরে বেঁচে থাকা মানুষদের কথা শুনিয়ে ছোটদের কোন পথে অতীন বড় করে তুলতে চান সে বিষয়টি স্পষ্ট বোঝাযায় উপন্যাসগুলিতে। দুঃখ কষ্ট না পেলে মানসিক গুণাবলী ফুটে ওঠে না, তাই ছোটোদের দরদী মনে তিনি মানবতার বীজ পুঁতে দিয়েছেন।

আসলে জীবন থেকে উপন্যাসে পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় যে মুখ্যত বিনির্মাণপন্থী, এতে সংশয় নেই। কেননা তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে সংযোগের প্রত্যাশা করেন, সেখানে দীর্ঘায়িত মননের গুরুত্ব খুব বেশি। পরস্পর ভিন্ন

আখ্যানের সঙ্গে তিনি মূলত সঞ্চারিত করে দিতে চান 'বেঁচে থাকার লীলা খেলা, মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা থেকে শুরু করে মানব সভ্যতার আবহমানকালের কিছু নীরব অনুভূতি।' অতএব অতীনের কথাবীজগুলির অঙ্কুরায়ণে আমরা লক্ষ করি, ইতিহাস ও কল্পনার দ্বিরালাপ, বিবরণ ও বিষাদময়তার পারস্পরিক উদ্ভাসান, বিবিধ সামাজিক বাস্তবে মানবিক প্রকল্পের বিচিত্র উন্মোচন। এও দেখতে চাইব, ঔপন্যাসিক কীভাবে যথাপ্রাপ্ত ইতিহাসকে পুনঃনির্মাণ করেছেন এবং তাঁর লিখন প্রকরণে নিজস্ব বিশ্বাস দোলাচলতা ঐতিহ্যবোধ আদিকল্প বিদ্যমান। সবকিছুর মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে আছেন তিনি, ছড়িয়ে আছে তাঁর বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, বিচিত্র স্ববিরোধীতা, পর্যবেক্ষণের দক্ষতা ও কল্পনার স্বাধীন দ্রাঘিমা। এইসব খুঁজতে খুঁজতে একবিন্দু থেকে অন্যবিন্দুতে সরে গেছেন তিনি, তৈরি হয়েছে তাঁর বহু আলোচিত নিঃসঙ্গতা, তাঁর চেতনার আলো আঁধার এবং ঘর খোঁজা ও ঘর হারানোর প্রক্রিয়া। অতীন আসলে একইসঙ্গে লেখেন জীবন- কথা ও ইতিহাস-কথা, নির্মাণ ও বিনির্মাণের এই ক্রমিক প্রক্রিয়ায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

অথ্যসূত্র :

১। অমর দে (সম্পা), 'গল্পসরণি', 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা', বিংশতি বর্ষ, ২০১৬, পৃ: ৮৫

২। সংবাদ প্রতিদিন, রবিবার, ২০ জানুয়ারি, ২০১৯, পৃ: ৪

৩। তদেব পৃ: ৪

৪। তদেব পৃ: ৪

৫। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (অখন্ড সংখ্যা), চতুর্দশ অখন্ড সংখ্যা, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৫, পৃ: ৪

৬। তদেব পৃ: ১০১

৭। অমর দে (সম্পা), 'গল্পসরণি' অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষ সংখ্যা' বিংশতি বর্ষ, ২০১৬, পৃ: ৯২

৮। তদেব পৃ: ৯৩

৯। তদেব পৃ: ১৪৬

১০। তদেব পৃ: ১০১

আকর গ্রন্থ

১। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উপন্যাস সমগ্র' (প্রথম খন্ড), প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০০৪

২। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পাঁচটি উপন্যাস', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১১

৩। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (অখন্ড সংখ্যা), চতুর্দশ অখন্ড সংখ্যা,

কলকাতা, করণা প্রকাশনী, ২০১৫,

সহায়ক গ্রন্থ

১। সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্য: বর্তমান প্রেক্ষিতে,' প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৫

২। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের পুত্তলিকা', তৃতীয় সংখ্যা কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪

সহায়ক পত্রিকা

১। অমর দে (সম্পাদক), 'গল্প সরণি', 'অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা' বিংশতি বর্ষ, ২০১৬

স ম্প দ দে

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবন মহিমা' পাঠকের দর্পণে

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। 'জীবন মহিমা' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উপন্যাস। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে ভাবার অবকাশ নেই। উন্মাদের মত ছুটতে হয় পরিণতির দিকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তেমন কিছুই নেই। আছে সাধারণ চাওয়া এবং না পাওয়ার যন্ত্রণা। সাধারণ জীবনকে জানবার ইচ্ছা পাঠককে এমন করে ছোটাতে পারে 'জীবন মহিমা' না পড়লে বোঝা যাবে না। মানুষের অবচেতনে চেপে রাখা ইচ্ছা যে অনুকূল জল হাওয়া পেলে অঙ্কুরিত হবে তা বলে দেয় 'জীবন মহিমা'। জীবন আমাদের প্রতিনিয়ত অভিনয় করতে শেখায়, শেখায় অভিনেতার মুখোশ খুলতে। যৌনতা যে জীবনে বাঁচার অন্যতম প্রেরণা তা যেমন উঠে আসে উপন্যাসে, তেমনই উঠে আসে যৌনতাকে ভিতর থেকে ঠান্ডা করার জন্য অন্তরের উত্তাপ। বিধবা মিনতিকে অঙ্কুরিত হওয়ার অনুকূল জল হাওয়ার স্পর্শ দিয়েছিল মহিম। অঙ্কুরিত হলেই তো আর ফুলে ফুলে ভরে ওঠা যায় না, দরকার উর্বর মাটি। অবনকে ঘিরে উর্বর মাটির আশ্রয়-আশা পেয়েছে মিনতি। ভরসা করেছে, ভরসাও পেয়েছে। আর তাতেই সংসার সমাজের সব বন্ধনকে তুচ্ছ করে ছুটে গেছে জীবনের পথে। যদিও এই চলার শক্তি পেতে তাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে যৌবনের অনেকগুলি দিন। প্রায় মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে আসা মিনতি বুঝতে পেরেছিল সকলকে ফাঁকি দিলেও নিজের মনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এই উপলব্ধি একদিনে নয়, ধাপে ধাপে অর্জন করতে হয়েছে। লেখক এখানে অসাধারণ জীবন দর্শনের পরিচয় রেখেছেন। তিনি জানতেন হঠাৎ কোনো ঝোড়ো হাওয়ার ঠেলায় মিনতিকে পথের মাঝে এনে দাঁড় করানো যাবে না, একটু একটু করে ঠেলা দিয়ে তাকে মুক্ত করতে হবে। এই উপন্যাস তাই স্বাভাবিক জীবন পথ থেকে ছিটকে যাওয়া মিনতির অবনের হাত ধরে জীবন-পথে উত্তরণের ইতিহাস।

জীবনের এই ছবি উপন্যাসে তুলে আনা একদিনে সম্ভব হয়নি। উপন্যাসের জন্ম কখন, কী মূর্তিতে, কোন আঁতুর ঘরে এই নিয়ে বিতর্ক কম নেই। আজও চলছে।

তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক স্রষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে নারী স্বাধীনতা, প্রেম সমাজে সেভাবে স্বীকৃতি পায়নি। তার কলম তাই ইতিহাস ও রোমান্সের আশ্রয় নিয়েছিল। কাহিনিতে নারী -পুরুষ উঠে আসলেও তারা প্রায় বেশির ভাগই ছিল রাজা-বাদশাহ বা জমিদার বাড়ির গৃহকর্তা বা গৃহকত্রী। নারী প্রেম সেভাবে স্বীকৃতি তো পায়নি বরং সমাজের অপরাধ হিসাবে দেখিয়ে বিধবা নারীদের আত্মহত্যা করিয়ে সমাজকে সাফ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই ধারা থেকে একধাপ এগিয়ে বিধবা নারীর প্রেমকে স্বীকৃতি না দিলেও মেরে ফেলেননি, কাশিবাসিনী করেছেন। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে উপন্যাসের আঙিনায় এসেছেন শরৎ চাটুজ্জে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর কতজন কতরকম ভাবে যে জীবনকে উপন্যাসে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন বর্তমানে তাদের সকলের নাম বলতে পারার চেষ্টা করাও দুঃসহ, এটা সে স্থানও নয়। উপন্যাস পেয়েছে মহাসাগরের ব্যাপ্তি। বহু নদীর সম্মিলনে সৃষ্ট মহাসাগর বর্তমানের উপন্যাস। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে প্রধান একনদী। তাঁর কলম মূলত উপন্যাসের হলেও 'পঞ্চাশটি গল্প'সংকলনের জন্য ২০০১ সালে পেয়েছেন 'সাহিত্য একাদেমি' পুরস্কার। দেশভাগের পর জীবন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আকুল অন্তরবাসনা তাকে স্থির থাকতে দেয়নি। ছুটে বেরিয়েছেন। কলমও ছুটেছে। সহজ সরল ভাষায় সাধারণের কথা নিয়ে রচিত উপন্যাস তাকে তুলে এনেছে অসাধারণের সারিতে। জন্মভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে জীবন জীবিকার সন্ধান করতে গিয়ে বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। কোথাও সমস্যার মধ্যে থেকে সমাধানের চেষ্টা করেছেন, পেয়েছেন তৃপ্তি, আবার কোথাও সমাধান না করতে পারার যন্ত্রণা। গড়ে উঠেছে সমস্যাকে বাইরে থেকে দেখার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রথম দিকে তাঁর মানসিক অবস্থা লেখালিখির অনুকূল ছিল না। তার অভিজ্ঞতার কথা বন্ধুদের বলতেন। তাদেরই উৎসাহে লিখলেন প্রথম গল্প 'কার্ডিফের রাজপথ'। এরপর একে একে বেরিয়ে এল অসাধারণ সব উপন্যাস। 'সমুদ্র মানুষ', 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে', 'অলৌকিক জলযান', 'ঈশ্বরের বাগান, 'দুই ভারতবর্ষ', 'নগ্ন ঈশ্বর', 'মানুষের ঘরবাড়ি' প্রভৃতি সহ শতাধিক উপন্যাস। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসটি এতটাই বিশিষ্টতা পেয়েছে যে উপন্যাসটিকে'উপমহাদেশের বিবেক' আখ্যা দেওয়া হয়। ২০০৮ সালে সুরমা চৌধুরী মেমোরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ইন লিটারেচার অ্যান্ড জার্নালিজমে 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' সম্মানিত হয়। সম্মান মূল্য দশ লক্ষ টাকা। এছাড়াও পেয়েছেন 'মাণিক স্মৃতি পুরস্কার' (১৯৫৮), বঙ্কিম পুরস্কারের (১৯৯৮) মতো বহু পুরস্কার। বহু ভারতীয় ভাষায়, এমনকি ইংরেজিতেও তাঁর উপন্যাস অনুদিত হয়েছে।

'জীবন মহিমা' জানুয়ারি ১৯৮৫ সালে (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স) প্রথম প্রকাশিত হয়। দুই পর্বের এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন প্রফুল্ল রায়কে। প্রত্যক্ষ চরিত্রের উপস্থিতি পাই প্রায় ষোলো জনের, শুধু নাম রয়েছে সাত জনের। তার মধ্যে উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত না থেকেও কাহিনির গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে। মিনতির মৃত স্বামী অশোক। সমগ্র উপন্যাসটি মিনতি চরিত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। দুটি পর্বের এই উপন্যাসের প্রথম পর্বে আছে গুমটি ম্যানের টিয়াপাখির মত মিনতির বড়বাবু অর্থাৎ তার শ্বশুরের দেওয়াল ঝুলে চেঁচানো, স্বাধীনভাবে বিচরণের ইচ্ছা এবং বিচরণ না করতে পারার যন্ত্রনা। বড়বাবুর খাঁচার এই পাখি উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে হয়েছে বেসামাল। বেরিয়ে এসেছে খোলা আকাশের নীচে। অশোক স্টেশনের বড়বাবুর একমাত্র পুত্র। বিয়ের দুবছরের মাথায় তার মৃত্যু হয়েছে। শুরু হয়েছে যৌবনে ভরা-ভর্তি তথা এ বাড়ির একমাত্র পুত্রবধুর বৈধব্য জীবন। না তাকে একা কাটাতে হয়নি, তার এই দুঃসহনীয় যন্ত্রণার দিনগুলি কাটাতে সাহায্য করেছে বা সঙ্গ দিয়েছে তার ছোট্টো ননদ ফুলঝুরি ও মৃত ননদের ছেলে দেবল। মিনতির এই নিঃসঙ্গ জীবন ও তার পরিণতির অসাধারণ ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন উপন্যাসের শুরুতেই।

> "সামনে বিরাট নিঃসঙ্গ প্রান্তর। তার পাশে রেল লাইন শীর্ণ নদীরেখার মত এঁকে বেঁকে অনেক দূরে চলে গেছে। স্টেশনের লাল বাড়িগুলো রোদের আলোয় ঝকঝক করছিল। আর সেই বকুল গাছটা থেকে বসন্তের হাওয়ায় ইতঃস্তত ফুল ঝরে পড়ছে। স্টেশন এবং মাঠ অতিক্রম করলেই নদী এবং তারপরে কাশবন। পায়ে হাটা পথ গ্রাম্য পুরুষেরা পথ ধরে স্টেশনে উঠে আসছিল।"

আসলে এ হল মিনতির নিঃসঙ্গ জীবনে সৌন্দর্যের হাতছানি। গ্রাম্য পুরুষেরা স্টেশনে উঠে আসার অর্থ গ্রামীন আটপৌরে চিন্তাভাবনার বদল ঘটছে। নিঃসঙ্গ হয়ে জীবন থেমে থাকে না। ট্রেনের গতিতে ছুটে চলেছে সামনের দিকে। তোমাকেও ছুটতে হবে মিনতি। না মিনতি সামনের দিকে ছোটেনি, যৌবনের আবেগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেবল, ফুলঝুরি আর শ্বশুরকে নিয়ে কাটিয়ে দেবে জীবন। কাটাচ্ছিলও তাই। মা মরা দেবলের মাছের মত চোখ মিনতিকে স্থির রেখেছিল। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিয়েছে। ওদেরকে মানুষ করবার ব্যস্ততায়। কিন্তু রাতে উঁকি দিয়েছে তার অতৃপ্ত যৌন পিপাসা। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব বেদনার স্মৃতিরা এসে মিনতিকে আক্রমণ করে। 'মিনতির শুয়ে থাকতে কষ্ট, বসে থাকতে কষ্ট, পাশে দেবল দিন দিন ঢ্যাঙা হচ্ছে। যত বড় হচ্ছে দেবল মিনতির ভিতরে ভিতরে বাঁচার এক তীব্র প্রলোভন'। দেবলের শরীরে অশোকের চিহ্ন আবিষ্কার করে লজ্জায় বলতে ইচ্ছে করে-'কাল তুমি দেবল নীচে মাদুর বিছিয়ে শোবে। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে শুতে আমার ভয় করে।' আর ঈশ্বরকে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করেছে — 'আমাকে ঈশ্বর তোমার হাতের যৌন

পুতুল করে দিও না'

এভাবেই কাটিয়ে দেবে ভেবেছিল জীবন। সব কাজের মধ্যেই একটা বিশুদ্ধতার ভাব রাখার চেষ্টা। যখন তাতেও ব্যাঘাত ঘটছিল তখন পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেয়েছে। মালগাড়ির 'টংলিং টংলিং' বাঁশির আওয়াজ মিনতির এই ছদ্ম-ব্যস্ততাকে আঘাত করলেও ভাঙতে পারেনি। নিঃসঙ্গতা প্রায় কেটে গেছে। শ্বাশুড়ি মারা যাবার পর সে-ই হয়ে উঠেছে বাড়ির অঘোষিত কর্তা। একহাতে সব কিছু সামলেছে। দেবলের বলিষ্ঠ চেহারা দেখে অন্তরের লালসা উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করলে নিজেকে শাসন করেছে কঠোরভাবে। যে বড়বাবু সবকিছু হারিয়ে আত্মহত্যাই মুক্তির একমাত্র উপায় ভেবেছিলো মিনতিকে আশ্রয় করে তাও উবে গেছে ।

এই যখন অবস্থা তখনই উপন্যাসের মোড় ঘুরতে শুরু করেছে। 'চোখের বালি'র মায়ের ঈর্ষার মত দেবলকে অন্য মেয়ের সঙ্গে মিশতে দেখে ঈর্ষা জেগেছে মিনতির। ভেবেছিলো সারাজীবন দেবলের ভাব-ভাবনা তাকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। বৌদির মুখের উপর দেবল না করতে পারে, দেবলের জগৎও যে কোনোদিনও আলাদা হতে পারে তা সে কল্পনাও করেনি। এখান থেকেই আবার শুরু হয়েছে মিনতির নিঃসঙ্গতা। বড়বাবু কিন্তু সব আঁচ করতে পারলেন। "বয়সন্ধির ছেলেমেয়ের মত নিজেকে, নিজের চারপাশকে সৌন্দর্যে ভরিয়ে তুলতে চায়"। মনের অজানা এক প্রেরণায়। যাকে আমরা বলতে পারি সুপ্ত যৌনতা। শুরু হল মিনতির আবার অভিনয়। শুদ্ধতা রক্ষা করার চেষ্টা। বড়বাবুর মনোভাবেই তা স্পষ্ট।

> "জান বৌমা জোরে ও পড়ছে ওর নিজের কোনো অবাঞ্চিত সুখকে ভুলে থাকার জন্য। বৌমা ওটা যে আমাদেরও হত। বৌমা ওটা যে এখন তোমারও হয়। তুমি বৌমা নিরামিষ আহার করে এবং সৎব্রাহ্মণীর মত থেকে ফুলঝুরির মত জোরে জোরে পড়ার চেষ্টা করছ।"

মিনতির বৈধব্য জীবনে কামনা বাসনা যত যন্ত্রনা দিচ্ছিল, বড়বাবু সম্মানজনক জীবনের জন্য যত সাহস জোগাচ্ছিল, ততই মিনতি হয়ে পড়ছিল বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ ও একাকী। এমতাবস্থায় মিনতির জীবনে ঘটল মহিমের আগমন। যে মহিম সম্পর্কে কোনো সুখস্মৃতি মিনতির ছিল না, ছিল ঘৃণা ও সংকোচ। কিশোরী মিনতিকে শরীরের স্পর্শ চিনিয়েছিল মাতাল করেছিল তাদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া মহিম। সেই মহিম ভাগ্যচক্রে ফিরে এসেছে মিনতির শ্বশুর বাড়িতে। উঠেছে ফুলঝুরির সঙ্গে মহিমের পুত্র সাধনের বিবাহের কথা মিনতিকে যেতে হয়েছে মহিমের বাড়িতে। শুধু এটুকুই নয় মহিম সম্পর্কে মিনতির ঘৃণা ও সংকোচ থাকলেও মহিমকে আশ্রয় করেই মিনতির অবচেতন ডানা মেলতে শুরু করেছে। লেখকের বর্ণনাতেও তা স্পষ্ট।

মহিমের বাড়িতে "মিনতি বিকেলে যাবে স্থির হতেই কেমন একটা আয়েস বোধ করল" রহস্যময় মহিমের বাড়ির রহস্যময়তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলল মিনতি। এতদিনের জীবনকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা ও ইচ্ছা মহিমের রহস্যময়তার সামনে মাথা তুলতে পারেনি, ধরা দিয়েছে মহিমের হাতে। অপার তৃপ্তি নিয়ে ফিরে এসেছে। লেখকের কথায়-'ওর চারিদিকে সবুজ এক প্রান্তর খেলা করে বেড়াচ্ছে', কতদিন পরে এক তীব্র দহনের জ্বালা নিবারণ করে মিনতি ফিরেছে।'

উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে মিনতি হয়েছে বিক্ষিপ্ত। শরীর, মন সবদিক থেকেই বেসামাল। "ঘুম ভাঙতেই মিনতি হতবাক। শরীরের সায়া শাড়ি বেসামাল।... ছিঃ ছিঃ ! এমন তো তার কখনও হয় না।" বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হিসাবেও তাঁর নিয়ম নিষ্ঠার ত্রুটি হয় না। আর তাই ছাত্র ছাত্রীদের কাছে তো বটেই সহকর্মীদের কাছেও একটা ইমেজ আছে। কিন্তু সে গর্ভবতী— একথা জানাজানি হলে সে ইমেজ কোথায় যাবে। এই আতঙ্কে সকল লোকের মাঝে থেকেও সে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন, একলা হয়ে পড়ছিল। সব কাজ, সবচিন্তা প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়েছে। এই অবস্থায় আত্মহত্যার পথ ছাড়া গতি নেই। তবুও মাস্টার অবনকে আশ্রয় করে শেষবারের মত তার বাঁচার চেষ্টা। ঠিক সেই সময় শাড়িতে রক্তের দাগ, ঋতুমতীর চিহ্ন মিনতির ভিতরে এক আশ্চর্য সুষমা সৃষ্টি করল। "বেঁচে থাকার এমন আকুলতা সে কখনও আর অনুভব করেনি। ঝড়-জলের মধ্যেই সে অবনকে জড়িয়ে ধরল"।

হীরেন চট্টোপাধ্যায় 'জীবন মহিমা' সম্পর্কে বলেছেন 'বয়ঃসন্ধি এবং শরীর খেলারই উপন্যাস জীবন মহিমা' [১]। কিশোর বা বয়ঃসন্ধির স্মৃতি মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর'-এ বলেছিলেন -"বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে' [২]। না এই উপন্যাসে মিনতির বাল্যের ভালোবাসার কোন সুখকর ছবি নেই, নেই ভালোবাসার অভিসম্পাতের ছবি। আছে তিক্ত অভিজ্ঞতা। এক পাপবোধ (শৈশবে মহিমের যৌনসঙ্গ) মিনতিকে বয়স্কা রমণীর মতো করে তুলেছিল। নিরন্তর অনুশোচনায় তার কেবলই মনে হতো এই ভুলের মাশুল তাকে জীবনভর ভোগ করতে হবে। এই ভেবে দেব-দ্বিজে ভক্তি বেড়ে গিয়েছিল। মন্দিরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকত'। সেবাইত কাকারা বলত-আপনার ছোটো মেয়ে বড় সৌভাগ্যবতী'। অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি পেতে মিনতি যেমন বয়স্কা রমনীর মত আচরণ করেছিল, ভক্তির আশ্রয় নিয়ে চেষ্টা করেছিল ভিতরে ও বাইরের লেগে থাকা পাপের কালিকে ধুয়ে ফেলতে। কিন্তু শৈশবের প্রেমের মত শৈশবের পাপবোধও সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়। তাই বড়বেলাতেও পাপবোধ থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পোশাকি জীবন গড়ে তুলেছিল মিনতি। স্কুলে কম কথা বলার অভ্যাস, পুরুষ মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণা এসব

দেখিয়ে সে শুরু করে ভাবের ঘরে চুরি করা, ভেবেছিল বোধহয় এই ভাবেই চলে যাবে জীবন, কিন্তু জীবনের মহিমা যে কতবড় তা কিশোর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝা সম্ভব হয়নি, জীবনের মহিমা অপার অনন্ত, জীবনের সে কিছুই জানেনা এটা বুঝিয়ে দেওয়ার উপন্যাসও জীবন মহিমা।

সমগ্র উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান, নারী স্বাধীনতার কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে সংসার বাঁচাতে যুবতী পুত্রবধূকে সমাজ সংস্কার, দায়িত্ব কর্তব্যের লোভ দেখিয়ে নিজ স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে আটকে রাখার চেষ্টা। উপন্যাসে অন্যান্য চরিত্ররা এসেছে মিনতির জীবন পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। প্রথম পর্বের অন্যতম প্রধান পুরুষ চরিত্র মহিম বিবাহযোগ্য পুত্রের পিতা হিসাবে তার আচরণ যেমন হওয়া উচিত তেমন হয়নি বরং পুত্রের চেয়ে বেশি আগ্রাসী যুবক বলে মনে হয়েছে। ঔপন্যাসিক অসাধারণ ভাবে এনেছেন জীবনের রহস্যময়তার ছবি, মহিম চরিত্রটি, তার বাড়ি, তার চারপাশের পরিবেশ কথাবার্তা সবই রহস্যময়, আর সেই রহস্যের অতলে সাময়িকভাবে ডুবে গেছে মিনতি। নিজের সব বাঁধন আলগা করে হারিয়ে গেছে মহিমের গোলক ধাঁধায়। যে মহিমকে সে ঘৃণা করে, মনে হয় তার জীবনের অশুভ শক্তি সেই মহিম মিনতির দিকে না তাকালে ভয়ঙ্কর রাগ হয়। মহিম এবং লেখা এই দুইজনের উপস্থিতি মিনতির মনস্তত্ত্বের খোলস উন্মোচনে বড় ভূমিকা পালন করেছে। দেবলের পাশে লেখাকে না দেখলে মিনতির নিঃসঙ্গতা ও শূণ্যতার অনুভবই হয়তো হতো না।

দ্বিতীয় পর্বে অবন মিনতি সম্পর্কে রয়েছে অসংগতি। অবনকে দিয়ে ঔপন্যাসিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করালেন। জীবনপথ থেকে ছিটকে যাওয়া মিনতিকে ফিরিয়ে আনলেন জীবনের স্বাভাবিক পথে। কিন্তু প্রথম পর্বে অবনের কোনো উপস্থিতি আমরা টের পাইনা। দ্বিতীয় পর্বে হঠাৎ অবনের আবির্ভাব মিনতির স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে। এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে অথচ সহকর্মীরা কেউ টের পাচ্ছেন না, এখানে সহকর্মীদের কথা বা মিনতি অবনের সম্পর্ক নিয়ে তাদের মনোভাবের পরিচয় লেখক যদি দিতেন এবং প্রথম পর্বে অবনের যদি বিক্ষিপ্ত উপস্থিতি থাকত, সেইসঙ্গে অবন মিনতির কলেজ জীবনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কোনো বর্ণনা উপন্যাসে থাকলে অবন-মিনতি সম্পর্ক আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারতো। অবনকে নিজের জীবনে জড়ানোর পিছনে মিনতির দুটি উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। প্রথমত বিধবা যুবতীর গর্ভবতী হওয়ার মত যে কলঙ্ক রটতে চলেছে বলে তার আশঙ্কা, অবনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠলে আত্মহত্যার পর সকলে মনে করবে সেই কলঙ্কের কালি অবন লাগিয়েছে। মহিমের ধারণা কেউ মনে আনবে না, দ্বিতীয়ত যদি বাঁচা যায় তাহলে অবনের সরলতাকে আশ্রয় করে বাঁচার চেষ্টা।

যাইহোক একথা বলতেই হয় এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক 'জীবন মহিমা' উপন্যাসেও গল্পবলার অসাধারণ কৌশলে বজায় রেখেছেন। 'উপমহাদেশের বিবেক' উপন্যাসের লেখকের বিবেকের উঁকিঝুঁকি চরিত্রগুলিকে ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে গেছে উন্নত পৃথিবী সৃষ্টির আশায়। কল্পনার জগৎকে লৌকিক ভাষায় বেঁধে তার উপস্থাপনার গুণ উপন্যাসটিকে উপভোগ্য করেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। উপন্যাস সমগ্র' (৩য়) অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ১মপ্রকাশ ২০০৬, কোলকাতা। ভূমিকা। তিন।

২। উপন্যাস সমগ্র' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ ১৪০৯, কোলকাতা-৭৩, ৪৮৩ পৃ.।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস সমগ্র (৩য় খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ ২০০৬, কোলকাতা।

২। 'উপন্যাসের সমাজ দৃষ্টিঃ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ' জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, নভেম্বর ১৯৯০।

৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' সুকুমার সেন (৩য় খণ্ড) আনন্দ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা।

৪। সাহিত্য কোষ, কথাসাহিত্য' অলোক রায় (সম্পাদিত), বাগর্থ প্রকাশনী; এপ্রিল ১৯৬৭, কোলকাতা।

র বী ন ব সু

সংযোগ-সেতু

অগণন তারার মধ্যে যে আলো অস্পষ্টতা
মিহিস্পর্শে তাকে ধরে রাখে মহাকাশ;
উদ্বিগ্ন অন্ধকারে অস্থির সময়
ব্ল্যাকহোল টানে তছনছ হয়ে যায়
ঠিক যেন ঘরে ফেরা ধর্ষিতা মেয়ে।

অবলোকনহীন এই দেখা, সমূহ বিনষ্টির
প্রান্ত ছুয়ে নির্বিকার রাত্রিজাগা;
তোমাদের চিন্তার গভীরের সুতো
সেকি লাটাইবিহীন শূন্যতায় ভরা!

দিন বদলের খড়িদাগ নাকি খোদাই করা গুহাগাত্র
সবটাই এখন অনুমান-নির্ভর;
যেমন চন্দ্রপৃষ্ঠে বিক্রম...
সংকেতহীন বিপর্যয়হীন প্রত্যাশা-উন্মুখ
এক অবতরণ;

মাঝখানে কোথাও কি নিঃশব্দে ছিঁড়ছে গহিনাতীত
সম্পর্ক আর তার সংযোগ-সেতু!

তা প স রা য়

এসো, আমাকে গ্রেপ্তার করো ওগো নির্জন

আমার নিজস্ব এক বাইবেল চাই, ভালো-মন্দ নয়
ত্বকের গোপন খুলে সে আমাকে বিদ্যুৎ ছোঁয়াবে
চা ও বিস্কুটের সাথে সম্পর্ক যেমন
সে আমাকে হাওয়ার উপরে এনে তেমন ভাসাবে
আমি যেন গ্রীষ্মের ভেতরে গ্রীষ্ম, শীতে শীত হয়ে উঠতে পারি

এই যে উপন্যাসের পাসে দু'দণ্ড কবিতা হয়ে বসি
চাঁদ হাতে পাই, কয়েকটা শিশুর চোখে অমন তাকাই
বলা যেতে পারে, চুরি করি সম্পর্কগুলি
আমি তো নিজেই অত ধান ভানি, সোজা-উল্টো খেলে যাই
কিছুতেই কিছু অর্থ রাখি না আর জমিয়ে ফেলেছি খুব সন্দেহের ছুরি

বলো হে, ফেভারিট কেবিনের আড্ডাবাজ সখা
জলাভূমি ছেড়ে যাচ্ছে আমাদের, মিথ্যেকথা শোনাতেই পারে পাহাড়ি
ঝরোখা

নি র্ম ল সা ম ন্ত
এসো ছুঁয়ে থাকি

এসো, আমরা ছুঁয়ে থাকি হৃদপিণ্ডের স্বাদ
ছুঁয়ে থাকি বাতাস থেকে আহরিত সকাল আর সন্ধ্যা।
সন্তানের চিবুক থেকে ঠাকুমার পক্বকেশগুলো
জ্যোৎস্নার মতো এসো থাকি ছুঁয়ে।

কুয়াশার আড়ালে যেন রক্ত না ঝরে,
রোদ্দুরগন্ধে পায়ে পায়ে এসো ছুঁয়ে থাকি বন্ধুর নিঃশ্বাস।
ছুঁয়ে থাকি দীপজ্বলা সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি শুনে
বোনেদের গাওয়া গান
আর পুকুরঘাটে বাসন-ধোওয়া কাকিমার ঘ্রাণ সকালবেলার সূর্যে।

দুর্গম পাহাড়ি খাদে মৃত্যু যেন না দেয় উঁকি,
কৈশোর-ঝর্ণায় চোখ রেখে নর্তকী ছুঁয়ে থাকি
হৃদয়ে জেগে থাকা মেহগনি রঙে,
এসো ছুঁয়ে থাকি বনলতার বৈশাখী যত প্রেম
মেঘেদের ছায়া ধার ক'রে, আবিষ্ট বেলায়।

ছুঁয়েছি মুকুলবেলায় জোয়ারের ঢেউয়ের মতো,
ছোঁবো সবকিছু—
অরণ্যের হিমমাখা সবুজ থেকে পাহাড়চূড়ো—
ছোঁবো আমি স্পন্দিত বুকের সব অণু-পরমাণু।

দে বা র তি ভ ট্টা চা র্য

স্রোত

ভাসিয়ে নিয়ে যাও আমায় আবার ডোবাও
শুধু ওলোটপালোট খাই, তোমার ঘূর্ণি-ছোঁয়ায় হই বাস্তুহীন
ইচ্ছামতো আছড়ে ফেলো তাই সমুদ্রতটে—
মৃদু হাওয়ায় ঝরে পড়ে ভেজা শরীর থেকে বালুকণাদের আয়ু
তোমার গভীর স্পর্শ হরণ করে আমার সবটুকু শূন্যতা
তাই বুঝি নিক্ষেপ করো আরও আরও মহা শূন্যে...

ম ঞ্জু শ্রী স র কা র

অন্তহীন আলো

হিসাব শিখিনি।
কোনো এক হেমন্তের শিশির-সকালে
ছুঁয়ে গেলে তুমি।

মেঠো পথ।
মায়াবী-ধানের ঘ্রাণ।
দিঘির ভেতর থেকে তুলে
এনেছিলাম শাপলা-শালুক,
এঁকেছিলাম পদ্ম।
লিখেছিলাম কবিতা।
বুনেছিলাম স্বপ্ন
দুচোখে।
ভৌগোলিক সীমারেখার বাইরে
দাঁড়িয়ে।
নীল আকাশ যেভাবে দিগন্তে মেশে
সেভাবে আজও...

চৌধুরী নাজির হোসেন

সংখ্যা থেকে অসংখ্য

বাতাসে পাখিরা শিস দেয়
আমি রাস্তা পার হই
রকে বসে রগরগে যুবক
সংখ্যা থেকে অসংখ্য
উচ্চৈঃস্বরে আড্ডা জমে
তখনি এক কলেজ ফেরতা মেয়ে
রাস্তা ধরে হেঁটে আসে
আমি দেখি তার কামিজ ছুঁয়ে
অসংখ্য শিস উড়ে গেল
ছড়িয়ে পড়ল বাবেলের মতো
আকাশে বাতাসে।

ত্রি দে বে শ চৌ ধু রী

আমাদের জলতরঙ্গ-স্মৃতি-অজস্র রাগিনীরা শুনিয়েছে-আহির ভৈরবে

মাঝে মাঝে মনে হয়—শৈশব-কৈশোর-যৌবনের সবুজ-স্বপ্নের দিনগুলি—
সে-ই তেজ ভরা এক লাফে আকাশ ছোঁয়া—
স্নেহ-ভালোবাসা-প্রেমে আত্মীয়-বন্ধুরা-বান্ধবীরা—
সে-ই বোতাম-খোলা শার্টে ভুবন-ডাঙ্গার মাঠে-মামা-ভাগনে পাহাড়ের স্বপ্নের গোধুলি

স্মৃতি সতত-ই সুখের— দুঃখও আছে—
দুঃখ-রা আড়ালে থাকে-কৈশোর-যৌবনের তুড়িলাফে—
বয়স বাড়লে পরে— দুঃখরা মনে থাকে বেশি-কুয়াশা-বিষণ্ণতা ঘিরে—
আনন্দ-রা ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি ভরে বেদনার ভারে—

হারানো প্রিয়জনেরা-মাঝে মাঝে হানা দেয় স্বপ্ন-চমকে—
আনন্দ-ধারা বহিছে ভুবনে-রবি-কবি জানে—
আনন্দ-সুখেরা জানে তরী পার একা খেয়া-কিভাবে আনন্দে বায় নেয়ে—
ফুল ও আকাশ-তারা-সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালে-মেঘপরী-আঁচল-জ্যোৎস্না আরতিতে—

কেন জানি স্মৃতির অতল থেকে-হাতছানি দিয়ে কেউ ডাকে—
ভোলাপ্রেম-স্নেহ-ভালোবাসা-অক্ষয়-বটের ছায়ায়-আঁকি-বুঁকি কত লিখে রাখে
ভারি পদশব্দ জাগে-অরণ্যের শুকনো পাতা মাড়িয়ে-মাড়িয়ে—
আমাদের জলতরঙ্গ-স্মৃতি-অজস্র রাগিনীরা শুনিয়েছে-আহির ভৈরবে—

রূ প দা স

চালচিত্র

আমার উঠোন হতে সোনালী রোদ্দুর
ধীরে পায়ে হেঁটে যায় রক্তাভ সন্ধ্যার দিকে
বেঁটেখাটো যবুথবু ছায়া দীর্ঘ হতে হতে
ছুঁয়ে ফেলে শূন্যচারী মেঘের শরীর
অকস্মাৎ হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ে কলো যবনিকা
স্তব্ধ হয় শব্দমান স্নিগ্ধ চরাচর
আমি তামাদি চিঠির তোড়া ছুঁড়ে ফেলি জঞ্জালের স্তুপে
দুচারটে চিঠি হয় জোনাকীর আলো,
লেখার টেবিল ঘিরে ঘুরঘুর করে,
অন্ধকারে ডুবে থাকা আয়নায় ফুটে ওঠে
বেশ কিছু ভালো লাগা দৃশ্যের কোলাজ।
রাত-জাগা চোখ আর বিশ্বস্ত আঙুল
কালো ক্যানভাসে আঁকে আলো মাখা ছবি।
যাপনের বীজমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত আমি
রাত শেষে হাট করে খুলে ধরি জানালা দেরাজ
হাওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে উড়ান শুরু করে।

প ঙ্ক জ চ ক্র ব র্ত্তী

পরা অপরায়

তুমি বীজ পুতেছো পাথরে
আকাশ থেকে খন্ড বৃষ্টির বিন্দু সাগরে মিশে
অখন্ড হয়ে উঠলো জল
জল রাশি ঢেউ বুদবুদ।

মহাবিশ্বের কয়েদি হয়েও চাবি ছিলো তোমার হাতে
আকাশ পথে ধূসর মেঘ হয়ে
ফিরে এসেছো আমাদের কাছে। পালাতে পারোনি।

ভালবাসার বিষপানে চাঁদ হলে তুমি
তোমার ঘটে-পটে-আকাশে-মাটিতে
সুখ দুঃখের সাম্য বর্ণমালা
প্রবল চাঁদের আলো।

ত থা গ ত চ ক্র ব র্তী

সাবধান থাকো

ধরো, ফ্রান্সের কোন এক হোটেলে
তুমি অপ্সরীর সাথে রাত কাটাচ্ছো
তোমার ভারতবর্ষে,
বেড়েই চলেছে কালো বেড়ালের দাম।
সাবধান থাকো,
অচিরেই গণঅভ্যুত্থান।
চিতার থেকে দ্রুত ছোটা মানুষেরাই,
একদিন তোমার টেকো মাথায়,
কালো কালি দিয়ে জুতোর ছবি এঁকে দেবে।

জ য় গো পা ল ম ন্ড ল

সত্যের অপলাপ

জানি নিরপেক্ষ বলে কিছু হয় না
মিথ্যে মিথ্যে গণপ্রেম অঙ্ক কষা
বারে বারে বচন উচ্চারে খনা
দ্বারে দ্বারে বসে থাকে ভূতপ্রেত
কখন ফুড়কি ছেড়ে বেরোবে ভ্রূণ শ্বেত

বজ্র বিদ্যুৎ জল ভরা তালশাঁসের মতো গাভীমেঘ
প্রশান্ত সাগরে ডুবে যেতে যেতে ভেসে ওঠা ডলফিন
সবাই কি বোঝে নিরপেক্ষতা?
গাছ জন্মায়, ফল দেয় ফুল দেয়
জন্ম নেয় নতুন চারা
বেঁচেই থাকি বাঁচার আনন্দে

টান পড়ে পেটে তবুও শান বাঁধানো ফুটপাতে
বাচ্চার জন্ম হয়
শতবার্ষিকী আয়োজন।

জলের ঝাঁট যেদিক থেকে তীরের ফলার মতো আসে
সেদিকে তো কেউ মাথা বাড়ায় না
যেদিকে সুবিধা সেদিকে ঝোর টেনে দিতে হয়
তাই বলে কেউ যদি নিজেকে বিক্রি করে
তিনি কি নিরপেক্ষতার ফসল?

দুনিয়ার মানুষ এখন এক লাইনে
কাটামুণ্ড কাটাগলা কাটাহাত
সবটাই গরম পাতে কিংবা গলানো ইস্পাতের কড়াইয়ে
শুধু বিভীষণ অথবা জ্ঞানপীঠে শূল দিয়ে বসাও....

নুন খেয়ে গুণ গাওয়া পাখির অভাব হবে না
মানুষ কোথায় শিখবে
নিরপেক্ষতার হাঁড়িকাঠে কীভাবে দেবে মাথা?
যারা যারা নাচানাচি ক'রে নিরপেক্ষতার হার গলায় পরে
তার থেকে ফাঁসির দড়ি অনেক আরামের।

এনকাউন্টার কিংবা একচোখো বিচার করো
সবেতেই পশুরা মজা পায়।

ব ন্দ না সি ন হা ম হা পা ত্র

বাংলা নাটকের উদ্ভব যুগের কাহিনী ও সংলাপের পরিচয়

সারসংক্ষেপ

নাটক হল জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী এক মিশ্র সাহিত্য শাখা। কিন্তু বাংলা নাটকের পথ চলা বিদেশী ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনীকে ধার করে। অভিনয় শুরুর প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও বেশী পরে তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও যোগেশচন্দ্র গুপ্তের কীর্তিবিলাস' নাটক দু'খানির মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের নিজস্ব পায়ে পথ চলা শুরু। দুর্বল হলেও প্রথম দিন থেকেই বাংলা নাটক তার কাহিনি বৈচিত্রের জন্য প্রশংসার দাবি রাখে। আর এই কাহিনি ঘটনা পরম্পরায় সমাপ্তির দিকে নিয়ে গেছে যে সংলাপ সেও প্রশংসার দাবিদার। প্রশংসার পাশাপাশি একথাও স্বীকার করতে হয় কাহিনি বয়ন ও সংলাপের মধ্যে অনেক ত্রুটি থেকে গেছে। 'বাংলা নাটকের উদ্ভব যুগের কাহিনি ও সংলাপের পরিচয়' প্রবন্ধের মূল অংশে তা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

Key Word: Bengali Drama, Story, Dialogue, Composite art, Translation, Basic, Mythologically, Social, Koulinnapratha, Satire

মূল প্রবন্ধ

জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী অন্যতম ও গতিশীল সাহিত্যের শাখা হলো নাটক। নাট্যকার দর্শকের কথা মনে রেখে সমকালীন দেশ ও কালের পটভূমিকে বিষয়বস্তুর মধ্যে রূপ দেন। তবে তা শিল্পী সত্তার মুন্সিয়ানায় চিরকালের হয়ে উঠতে পারে— সমকালীনতার গন্ডি অতিক্রম করে। নাটক দৃশ্যকাব্য হওয়ায় নাট্যকারের উদ্দেশ্যও প্রত্যক্ষভাবে দর্শক চিত্তে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করতে পারে। নাট্যকারের জীবনাভিজ্ঞতা ও সামাজিক সহানুভূতি সমাজ মানুষের তাৎপর্যকে নতুনভাবে রূপ দিতে পারে নাটকের মধ্যে। সমকালীন সামাজিক সমস্যা যে সমস্যায় পীড়িত হচ্ছে নাট্যকার ও দর্শক, ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, সামাজিক মূল্যবাধের পীড়নে, অস্তিত্বের সংকটে তিলেতিলে অবক্ষয়ের পথে মানুষ অবক্ষয়িত হচ্ছে। তারই বিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত হয় নাটকের নানা আঙ্গিকে! যুগজীবনের দ্বন্দ্ব, রুচি-বিকৃতি, ভাব-ভাবনা, শীল-সদাচার,

আচার ব্যবহার, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি নাট্যকারের লেখনীতে জীবন্ত হয়ে ওঠে। বস্তুত উদ্ভব যুগের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক রুচির প্রেক্ষাপটে এই সময়কার নাটকের কাহিনি ও সংলাপের বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক।

উনিশ শতকে বাঙালি থিয়েটার এসেছে ইংরেজের থিয়েটারের আদলে এবং সেই থিয়েটারের দাবিতে অভিনয়ের প্রয়োজনেই লেখা হতে শুরু করেছে বাংলা নাটক। বাংলায় নাটক ছিল না বলে, এই সময়ে থিয়েটারে প্রথমে মূল ইংরেজি নাটক, পরে ইংরেজি ও সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ নাটক এবং শেষে মৌলিক বাংলা নাটকের শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

> "বাংলা-নাটকের সূত্রপাত উনিশ শতকে ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসনের পরিমন্ডলে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্বের পরে পরেই বাঙালির ভাবনৈতিক দাসত্বের শুরু হয়।"

রুশদেশীয় ভাগ্যান্বেষী নাট্যপ্রেমে আকৃষ্ট হয়ে দু'খানি নাটক বাংলাভাষায় অনুবাদ করেন। লেবেডেফের এই সদ্‌প্রচেষ্টা বাঙালির নাট্যচর্চার দ্বার সর্বপ্রথম উন্মোচিত করে। এরপর বাঙালি কর্তৃক প্রথম নাটক অনুবাদের প্রামাণিক তথ্য হিসেবে পাওয়া যায় কৃষ্ণমিশ্রের সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকের অনুবাদে। ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে তর্কপঞ্চানন এই অনুবাদ কর্মটি সমাপন করেন। জগদীশ (পূর্ণনাম অজ্ঞাত) ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে 'হাস্যার্ণব' নামে একটি সংস্কৃত হাস্যরসাত্মক রচনার বঙ্গানুবাদ করেন। এর মধ্যে 'প্রহসন' জাতীয় রচনার বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তবে রচনাটি অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। Asiatic Journal নামক ইংরেজি পত্রিকা অনুযায়ী জানা যায়, যে ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে 'ধূর্তনাটক' ও 'ধূর্ত সমাগম' নামে দুটি প্রহসন সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুদিত হয়েছিল। যদিও নাটক দুটির এবং নাট্যকারের নাম সম্পর্কে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার একটি নাটকের অনুবাদ করেন। এরপর ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে রামতারক ভট্টাচার্য 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' বাংলায় অনুবাদ করেন। এই নাটকটির মধ্যে (অনুবাদ কর্মটির) আয়াস ও শৌখিনতা ব্যতীত অন্যকিছু সেই অর্থে পাওয়া যায় না। নীলমণি পাল শ্রীহর্ষ রচিত "রত্নাবলী' নাটকটিকে বাংলায় অনুবাদ করেন ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে। এটি পদ্য মিশ্রিত একটি রচনা।

এই সময়ে কাহিনি বা দৃশ্যপরম্পরাগত সাযুজ্য না থাকলেও বেশকিছু প্রহসনও রচিত হয়েছিল, এরমধ্যে দ্বারকানাথ রায়ের 'বিল্বমঙ্গল'(১৮৪৫), পঞ্চনন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রমণী নাটক' (১৮৪৮) ও 'প্রেম নাটক' (১৮৫০) উল্লেখযোগ্য। বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায় তখনও পদ্য বিশেষত পয়ার ত্রিপদীর প্রভাব অপ্রতিহত ভাবে চলছিল। পদ্যের ছন্দ রচনায় ভারতচন্দ্র তখনও সকলের আদর্শ ছিলেন। সেইজন্য তাঁর অনুকরণে অনেকেই তোটক, চতুস্পদী, একাবলী মালঝাঁপ, ভুজঙ্গ প্রয়াত, মালিনী প্রভৃতি ছন্দও ব্যবহার করেছেন। কোনও কোনও কাহিনি উপস্থাপনায় মধ্যযুগীয় কাহিনি কাব্য বর্ণনার

সংস্কার তখনও সমাজ থেকে তিরোহিত হতে যে পারে নি, তাই-ই এর থেকে অনুভব করা যায়। এগুলির মধ্যে বা নামে নাটক শব্দটি থাকলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি আখ্যায়িকা কাব্যের রূপ লাভ করেছিল। নাটক বলতে যে প্রকৃত কি বুঝায় তা তখনও এদেশের সমাজ বুঝে উঠতে পারেনি। সেই জন্য যে কোন রচনাই তখন 'নাটক' নামে অভিহিত হতো।

বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্বে মৌলিক নাটক রচনার সূত্রপাত ১৮৫২ সালে তারাচরণ শিকদার ও যোগেশচন্দ্র গুপ্তের যথাক্রমে ভদ্রার্জুন' ও কীর্তিবিলাস' নাটকের মধ্যে দিয়ে। তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন' শুধু প্রথম নাটক নয়, তা প্রথম সার্থক নাটক। সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন—

> ''ইহাই (ভদ্রার্জুন) ইংরেজি ও সংস্কৃতের যুক্ত আদর্শে রচিত প্রথম মৌলিক মধুরাত্মিক বাঙ্গালা নাটক।'' [২]

মহাভারতের অর্জুন কর্তৃক 'সুভদ্রাহরণ' নাটকটির বিষয়বস্তু। বাংলা ভাষায় অভিনয়োপযোগী নাটক রচনার ইচ্ছা নিয়ে তিনি এই নাটক রচনা করেন এবং ভূমিকায় নিজেই লিখেছেন—

> "এতদেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত আছে এবং বঙ্গ ভাষায় তাহার কয়েকটি গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ দেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনায় শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ বঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজন্যই ভক্তগণ আসিয়া ভন্ডামি করিয়া থাকে। বোধহয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব হইতে সুভদ্রাহরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম।"

নাটকের সংলাপও গদ্যে-পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত। পয়ার ও ত্রিপদীতে পদ্যগুলি রচিত। গদ্যাংশের ভাষা সরল ও গ্রাম্যতা মুক্ত। গদ্য সংলাপের ভাষা আড়ষ্ট ও প্রাণহীন। নাট্যকার 'মাত্রাজ্ঞা', 'মাত্রাজ্ঞাহে', 'মাত্রাজ্ঞানুগামী', 'তবানুজেরা', মমানুজ ইত্যাদি সন্ধির ব্যবহার করেছেন যত্রতত্র। পদ্যসংলাপের মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

'কীর্তিবিলাস' নাটকের মূল বিষয় হল বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা কি বিপদ ঘটায় তার পরিণাম। সপত্নী পুত্রের প্রতি বিমাতার অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে রূপকথার গল্পের আদলে নাট্যকার কাহিনি বিন্যাস করেছেন। কীর্তিবিলাস ও মুরারির পিতা হেমপুরের অধিপতি মহারাজ চন্দ্রকান্ত। বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী হারিয়ে মহারাজ নলিনীকে বিয়ে করেন, আর নলিনীর ভাই রাজচন্দ্র রাজার পরামর্শদাতা হয়। এদিকে রাজার এক পারিষদ প্রাণনাথ ছিলেন দুরাচার ও লম্পট। তাকে দমন করতে গিয়ে কীর্তিবিলাস তার রোষানলে পড়ে। অপর দিকে কীর্তিবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হয় রাণী। কিন্তু

কীর্তিবিলাস তাকে ঘৃণা করে, ফলে সে রাজার কাছে কীর্তিবিলাসের বিরুদ্ধে কুৎসিৎ অভিযোগ আনে। রাজা পুত্রের প্রাণদন্ডের আদেশ দিয়েও তা ফিরিয়ে নেয় এবং তার পত্নী সৌদামিনী ভাবে তার স্বামীর বুঝি প্রাণদন্ড হয়েছে। সেজন্য সৌদামিনী আত্মহত্যা করে। এদিকে কীর্তিবিলাস ফিরে এসে পত্নীর অবস্থা দেখে নিজেও আত্মহত্যা করে। এখানেই কাহিনির সমাপ্তি। নাটকটি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। চটুল সংলাপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্বগতোক্তির বাহুল্য রয়েছে। 'কীর্তিবিলাস' নাটকের পদ্য পয়ারের শৃঙ্খলে বাঁধা। আবার কোথাও যাত্রারীতির মতো যমক, অনুপ্রাস অলঙ্কারের বাহুল্যও চোখে পড়ে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঊষালগ্নে যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তারাচরণ শিকদার ও যোগেশচন্দ্র গুপ্ত তার সদ্ব্যবহার করলেন হরচন্দ্র ঘোষ (১৮৫৩-১৮৭৪)। বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম একাধিক নাটক রচনা করার গৌরব অর্জন করেছেন তিনি। তাঁর চারখানি নাটক -'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫২), 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৭), 'চারুমুখ চিত্তহারা', 'রজত-গিরি-নন্দিনী' রচনা করেন কুড়ি বছরের ব্যবধানে। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব তাঁর নাট্য প্রেরণাতে প্রভাব জুগিয়েছিল।

শেক্সপীয়র রচিত The Merchent of Venice অবলম্বনে হরচন্দ্র 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' রচনা করেন। কিন্তু নাটকটির মধ্যে মৌলিকতার কোন প্রভাবই লক্ষ্য করা যায় না। সর্বোপরি নাটকটি রচনার মধ্যে তাঁর প্রতিভার কোনও সৃজনশীলতা ও মুন্সিয়ানার ছাপ পাওয়া যায় না। হরচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৭)। নাটকটি রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের বছর রচনা হলেও তার মধ্যে নাট্যকার সমসাময়িক কোনও প্রেক্ষাপট বা প্রেক্ষাভূমি সৃষ্টি করেন নি। মহাভারত থেকে কাহিনি ভাগ গ্রহণ করে তিনি এর মধ্যে একটি নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাটকের সর্বাপেক্ষা ত্রুটি নাটকটির ভাষা। শেক্সপীয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট'-এর অনুবাদ করেন হরচন্দ্র ঘোষ 'চারুমুখ-চিত্তহারা' নামে। ইংরেজি নাটকের অনুবাদ হওয়া সত্ত্বেও নাটকটি সংস্কৃত আদলে রচিত হয়েছে। নান্দী, সূত্রধার ও নর্তকী বা নটীর পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সর্বশেষ নাটক 'রজত গিরিনন্দিনী' ১৮৭৪ সালে রচিত। নাটকটি বর্মী অ্যাখ্যায়িকা অবলম্বনে লেখা ইংরেজি নাটকের অনুবাদ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই বাঙালি জাতির মধ্যে সমাজের কুপ্রথা দূরীকরণের সচেতনতা দেখা দিয়েছিল। সাহিত্যের সব প্রকরণের সাথে তাল মিলিয়ে সমাজ চেতনার দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসে নাটক এবং এরই সূত্র ধরে জন্ম নেয় বাংলা মৌলিক নাটক। উন্মেষ পর্বের প্রাথমিকতার নানারূপ অসঙ্গতি কাটিয়ে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪) বাংলার প্রথম মৌলিক নাটক। অবশ্য নাটকটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে লেখা। রঙপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৮৫৩ 'সম্বাদ

ভাস্কর' পত্রিকায় এরকম একটি নাটক লেখার প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন দেন। এই বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে রামনারায়ণ নাটকটি লেখেন এবং পুরস্কৃত হন।

১৮৫৪ সালে প্রথম সরকারের কাছে কৌলিন্য প্রথা বহুবিবাহ রীতি রদ করার জন্য আবেদন জমা পড়ে। এ নিয়ে তখনও কোনো সামাজিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েনি। কিন্তু এ বছরই রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনা করেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামের নাটক। কেউ আবার একে সামাজিক রঙ্গচিত্র কিংবা সামাজিক নাটক হিসাবেও অভিহিত করেছেন। যে নামেই 'কুলীনকুলসর্বস্ব'কে চিহ্নিত করা হোক না কেন তার প্রহসনধর্মী বৈশিষ্ট্যকে আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারব না। এই বিষয় নিয়ে রামনারায়ণের আগে অন্য আর কোনো নাট্য প্রচেষ্টা ছিল না। কিন্তু নাট্যবিষয় কিম্বা নাটকের নামকরণ-কোনোটিও নাট্যকারের নিজস্ব উদ্ভাবনা নয়। কৌলিন্য প্রথার বিষয় সমস্ত সমাজজীবনকে তিক্ত করে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে ১৮৫৩ সালে জমিদারমশায় বিজ্ঞাপন দেন কৌলিন্য প্রথা হেতু কুলীন কামিনীগণের যে দুর্দশা ঘটেছে সে বিষয়ে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে একখানি নাটক রচনা করবার জন্য। বস্তুত, নাটকটি যে তীব্র কোনো সামাজিক আন্দোলনের কারণে রচিত হয়েছে এমন নয়। আবার নাট্যকারের আত্মপ্রেরণার ফল হিসেবেও এ নাটক রচিত হয়নি। বাইরে থেকে উদ্দেশ্যমূলকতার চাপই প্রহসনটির জন্মমূলে বর্তমান।

রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটকটিকে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের সুচনা লগ্নে, ফলে কালের নিয়মানুযায়ী তার নাটকে এই সময়কার সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের ব্যবহারের আধিক্যে বিশেষ করে আমাদের নজরে পড়ে নাটকের শুরুতেই 'নান্দী'। সূত্রধার এখানে প্রকাশ্য সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের পরিচিতি দিল। তারপরই নটীর গান। এখানে সংলাপ ও সঙ্গীতের মেলবন্ধন ঘটেছে। সূত্রধার এবং নটীর কথাবার্তায় বিবাহ নিয়ে সে সমস্যা উঠে এসেছে, তাই পরবর্তী স্তরে কুলপালক পরিবারে বিবাহ সমস্যায় প্রসারিত হয়েছে। এই টার্নিং পয়েন্ট না থাকলে নাট্যসংলাপের গতি আসতে পারত না। কাজেই নাট্য সূচনার সংলাপ অবশ্যই শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে।

সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশেও নাট্যকার Satire-এর ব্যবহার করায় হাসি কান্নার যুগলবন্দী ঘটেছে সংলাপে। নাটকে হাস্যরস প্রয়োগের সময়, দুই বিপরীত মানসিকতার ঘটনা নাট্যকার হাজির করেন, কুলীন পরিবারের কন্যার দুঃখদীর্ণ রূপটি নির্মমভাবে ফুটিয়েছেন, সংলাপই এ ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের হাতিয়ার হয়েছে। শুধু করুণ নয় হাস্যরসেও যে জাত শিল্পী ছিলেন রামনারায়ণ দুই ঘটকের সংলাপে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। নাট্যকার সৎ ঘটকের সংলাপকে আরও ক্ষুরধার এবং শ্লেষাত্মক করলে দর্শকরা আরও আনন্দ পেতো, সন্দেহ নেই। সেই আনন্দের খোরাক আছে উদরপরায়ণের কিংবা বিবাহবাতুলের সংলাপে। বেশ কয়েকটি নারী চরিত্র আছে, যাদের সংলাপে কোথাও চমৎকারিত্ব, কোথাও অতিরিক্ত ভাঁড়ামি।

ক) শাম্ভবীর সংলাপে বিদ্রোহিনী নারীর পরিচয় আছে- 'তা চল না ভাই, ঘরে তো বাবাকে বলি এমন বে দিলেই হয় না?' [৩]

খ) যশোদা পরিণত বয়স্কা, বিধবা। অল্পবয়সী পতি-পরিত্যক্তা কন্যাদের প্রতি পরম মমতায় যেন সে বলে—

"বল্লাল হইল কাল দিয়াচে কুলে শাল
সামাল সামাল ডাক ছাড়ি।
হলো বাসনা পূর্ণ কেবল বৈধব্য তুর্ণ
মন্ত্রের প্রভাবে উদমরাঁড়ি।।"[৪]

ত্রিপদী ছন্দের সংলাপ না হলে, চরিত্রটি যেমন আরও বৈচিত্রময় হত তেমনি নাটকও গতিময় হতো। পয়ার ছন্দে উচ্চারিত ফুলকুমারীর সংলাপেও এই ত্রুটি দেখি। আবার এর বিপরীতটাও পাই ছন্দে রচিত ভোলার স্বগতোক্তির মধ্যে তার কারণ পদ্য থেকে সরাসরি আঞ্চলিক কথ্য সংলাপে ঢুকে—

"ভোলা (স্বগত) মোগার কপালে দুক নেকেচে গোঁসাই।
খাট্টি খাট্টি মনু এটু বৃষ্টি পাই নাই।।
বসি ঘরে প্যাট ভরে খাতি নাই পাই।
চাকুরি ঝকমারি কাম করি মুই তাই।।"[৫]

সুতরাং যতই সংস্কৃতগন্ধী সংলাপ বর্তমানে নাটকে থাকুক না কেন, চরিত্রানুগ সংলাপ অবশ্যই বৈপরীত্য সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, রামনারায়ণ যদি আরও দু-দশক পরে কলম ধরতেন, তাহলে কুলীনকূল সর্বস্ব' সংলাপ আরও ঝরঝরে হতো। তবে চপলা সুলোচনা-চঞ্চলার সংলাপে উনিশ শতকের নারীদের কথ্য সংলাপের যে নিপুণ সুনিদর্শন রামনারায়ণ টেনেছেন, তাতে নাটকের জনপ্রিয়তার নিহিত উৎস বোঝা যায়।

বাল্যের সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে বাংলা নাটক যথার্থতা লাভ করে মধুসূদন দত্তের হাতে। মধুসূদন দত্ত সমাজের বেশ কিছু সমস্যা তাঁর দুটি প্রহসনের মধ্যে তুলে ধরেছেন। সেই সময়ের নানা জীবন্ত সমস্যাও দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে। তাই আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে বাংলা নাটকের উন্মেষ পর্বের নাটকগুলি কাহিনি ও সংলাপগত দিক থেকে ব্যর্থ হলেও পরবর্তীতে নাট্যরচনার ধারাকে ত্বরান্বিত করেছে।

তথসূত্র ঃ

১। দর্শন চৌধুরী :বিবর্তনের ধারায় বাংলা নাটক :সূচনা থেকে ১৯৫০, প্রবন্ধ সঞ্চয়ন, রত্নাবলী, পৃ. ৬৪২,কলকাতা-৯।

২। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ-৪৮,কলকাতা-৯।

৩। সন্ধ্যা বক্সী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ৬৬, কলকাতা-৬।

৪। সন্ধ্যা বক্সী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ.৩২,কলকাতা-৬।

৫। সন্ধ্যা বক্সী সম্পাদিত, রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনাবলী, সাহিত্যলোক, ডিসেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ৩৮,কলকাতা-৬।

খা দি জা খা তু ন

ঔপন্যাসিক বেগম রোকেয়ার 'পদ্মরাগ' : মুসলিম নারী জীবনের এক যন্ত্রণাময় প্রতিচ্ছবি

সারসংক্ষেপ

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো 'পদ্মরাগ'। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে। লেখিকা আলোচ্য উপন্যাসে কেন্দ্রিয় চরিত্র সিদ্দিকার যন্ত্রণাময় জীবন বর্ণনার পাশাপাশি সৌদামিনী, মিসিস হেলেন, সাকিনা, ঊষার জীবন যন্ত্রণাকেও তিনি ভাষা রূপ দিয়েছেন। এই উপন্যাস পাঠে একথা স্পষ্ট যে, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে নারীর অবস্থান একই।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু 'তারিনীভবন'। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তারিনীচরণ সেনের অকাল মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে স্বামীর নামে ভবনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভবনটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল নারীর কল্যাণ সাধন করা। সিদ্দিকা, সৌদামিনী, মিসিস হেলেন, সাকিনা, ঊষা এরা সকলেই কোনো না কোনো ভাবে অত্যাচারিত হয়ে তারিণীভবনে আশ্রয় নিয়েছে। লেখিকা শুধুমাত্র নারীর যন্ত্রণার কথা চিত্রিত করেই ক্ষান্ত হননি; তিনি মুক্তির পথও দেখিয়েছেন। তারিনীভবনের মেয়েরা দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছে—

> "এস যত পরিত্যক্তা কাঙ্গালিনী উপেক্ষিতা অসহায়া লাঞ্ছিতা -সকলে এস। তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা। আর তারিনীভবন আমাদের কেল্লা।"

জয়নব থেকে সিদ্দিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এক বর্ণনাময় ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

Key Word:
Padyarag,Troublesome, Tarinivaban, Welfare, Forcing, Giantess, Society, Reformation, Ruled, Ture, Independent

মূল প্রবন্ধ।

> 'আমি সমাজকে দেখাইতে চাই একমাত্র বিবাহিত জীবনেই নারীজন্মের চরম লক্ষ নহে, সংসার ধর্মই জীবনের সাধারণ নহে পক্ষান্তরে আমার এই আত্মত্যাগ ভবিষ্যতে নারীজাতির কল্যাণের কারণ হইবে বলিয়া আশা করি।'[১]

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের পদ্মরাগ অথাৎ সিদ্দিকা নিজের জীবনের এই লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করে। বিশ শতকের একেবারে শুরুর দিকে 'পদ্মরাগ' উপন্যাস লেখেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস। মুসলিম মেয়েদের জীবনের অবস্থা এখানে বর্ণিত। বেগম রোকেয়া মুসলিম মেয়েদের পর্দার আড়ালের অবরোধের জীবনকে এখানে তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র মুসলিম মেয়েদের কথাই নয় সামগ্রিকভাবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মেয়েদের জীবনের যন্ত্রণাকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সিদ্দিকা। তার সাথে সৌদামিনী, রফিকা, চারুবালা, মিসিস হেলেন হবেস এদের জীবন কাহিনীও বর্ণণা করে লেখিকা হয়তো এই বার্তাই দিতে চেয়েছেন যে, হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান নির্বিশেষে নারীর অবস্থান একই।

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য জীবনে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হল 'পদ্মরাগ'। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুর জেলার পায়রাবন্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু হয়। বেগম রোকেয়ার উপন্যাসের নারী সমস্যা মূল আলোচ্য বিষয়।

উপন্যাসটি আঠাশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের ভূমিকা লিখতে গিয়ে কলকাতার ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক বিনয়ভূষণ সরকার যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন তা হল—

> "কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রিষ্টান সকল সমাজের অনেক ক্ষত স্থান দেখিয়া মর্মে ব্যথা অনুভব করিতে হইবে। গ্রন্থকত্রী শুধু ক্ষতস্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই আপনার কর্তব্য শেষ করেন নাহ— তারিনী ভবনের পরিকল্পনায় তিনি ব্যাধির সমাধানেরও ইঙ্গিত করিয়াছেন।[২]

'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু 'তারিণীভবন'। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার তারিনীচরণ সেন অকালে দেহত্যাগ করার অল্প কয়েক বছর পর তার বিধবা পত্নী দীন তারিণী দেবর ভাশুর প্রভৃতি নিকটাত্মীয়দের প্রবল অনিচ্ছা অগ্রাহ্য করে, তার স্বামীর নামে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে তারিণী ভবন প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানেই তিনি বাস করেন এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি মিসেস সেন নামে পরিচিত। তার সমগ্র প্রতিষ্ঠানটির বর্ণণা লেখিকা দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে—

> "যে বিধবার তিন কূলে কেহ নাই, সে কোথায় আশ্রয় পাইবে? তারিণী ভবনে। যে বালিকার কেহ নাই, সে কোথায় শিক্ষা লাভ করিবে? তারিণী বিদ্যালয়ে। যে বিধবা স্বামীর অত্যাচারে চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, সে কোথায় গমন করিবে? ঐ তারিণী কম্মলয়ে। যে দরিদ্র দূরারোগ্য রোগে ভুগিতেছে, তাহারও আশ্রয় স্থল ঐ তারিণী আতুরাশ্রমে।"[৩]

প্রথমে তিনি বিধবা আশ্রম স্থাপন করেছিলেন। বিধবা আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়ে, তিনি তার কর্মকান্ড আরও বিস্তৃত করে তোলেন। নারী জাতির কল্যাণই মিসেস

সেনের একমাত্র উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি সমাজের মানুষের দেওয়া অন্যায় অপবাদও সহ্য করেন।

তারিণীভবনে একাধিক নারীচরিত্রের দেখা মেলে যথা— চারুবালা দত্ত (বয়স ৩৮ বছর), সৌদামিনী (বয়স ৪৩ বছর),-মিসিস হেলেন হরেস (বয়স-৪১ বছর)। এদের সকলের সঙ্গে বিভা, সিদ্দিকার পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রথমেই সৌদামিনী তার জীবনের করুণ পরিণতির কথা সিদ্দিকার কাছে উন্মোচিত করে। সৌদামিনীর বাবার বাড়ি গোরস্থান লেনে ছিল। কুলিনের কন্যা বলে তার বাবা ১৭ বছর বয়সে তার বিয়ে দেয়। সৌদামিনী যাকে মা হিসাবে জানত, সে আসলে তার গর্ভধারিণী ছিল না। সৌদামিনী সাত বছর বয়সে মাতৃহারা হয়েছিল। সৌদামিনীকে বিবাহিত পুরুষের সাথে না জানিয়ে বিয়ে দেয়।

সৌদামিনী স্বামীর ঘরে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই তার ওপর শুরু হয় নানা রকমের অত্যাচার। শুধু মাত্র বাড়ির লোকজনই নয়, পাড়া প্রতিবেশিনীদের দ্বারাও লাঞ্ছিত হতে হয়, বাড়ির নব বধুকে-এ অংশে তার পরিচয় মেলে। সৌদামিনীর ননদরা তাকে উদ্দেশ্য করে কাঁদতে আরম্ভ করে। তাদের কান্নার সুরের মধ্যে দিয়ে সৌদামিনীকে তীব্র অপমান ও ভৎর্সনা প্রকাশিত হয়। লেখিকা জীবন্ত ভাষায় তার বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন সৌদামিনীর ননদ দ্বয়ের কান্নার সুর ছিল—

> "লক্ষী তো গিয়াছে, এখন ডাকিনী আসিল।"

নানা দিক থেকে সৌদামিনীর জীবন অতিষ্ঠ ও জ্বালাময় হয়ে ওঠে। পাঁচ বছর পরে সৌদামিনীর ছেলে নগেন্দ্র ও মেয়ে জাহ্নবী তাদের মাসীমা শ্যামাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়। সৌদামিনী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে—

> "এখন হইতে ঐ শ্যামাদিদি আমার জন্য সুন্দ্র চিতা সাজাইয়া আমাকে পরতে পরতে দগ্ধ করিতে লাগিল।"৫

শ্যামা সৌদামিনীর শাশুড়ি ও বরের মনকে নানাভাবে মিথ্যা অজুহাতে বিষাক্ত করে তোলে। সৌদামিনীর শাশুড়িও শ্যামার কথায় বিশ্বাস করে, সৌদামিনীকে কটুক্তি করে। সৌদামিনীর একমাত্র আশ্রয় ছিল তার স্বামী। কিন্তু শ্যামা তার মনকেও কুলষিত করে তোলে। শ্যামা নিরাশ্রয় বিধবা ছিলেন। তাই এ সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করে, নানা ভাবে সৌদামিনীর জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। বেগম রোকেয়া অত্যন্ত সুনিপুণ ভাবে সে সব অত্যাচারের কাহিনী তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে।

তার স্বামীও একসময় তীক্ষ্ণ ভৎর্সনা করে। ধীরে ধীরে সৌদামিনীর শেষ একমাত্র আশ্রয় টুকুও হাতছাড়া হতে থাকে। আবার কোনো একদিন নগেনকে সিন্ধুকে বন্ধ করে রাখার অপবাদ দেওয়া হয়। তখন থেকে তার স্বামী কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এবার সম্পর্কে শেষ সুতোটুকুও ছিঁড়ে যায় সৌদামিনীর জীবনে। সে আশ্রয় গ্রহণ করে

আবার বাবার বাড়িতে। যদিও সৎ মাও তার দুঃখ বোঝে না। সৌদামিনী সম্পর্কে রটে গেল যে, সে তার স্বামীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এই ঘটনার পর থেকে তার নাম হয় রাক্ষসী। এর পর আবার জাহ্নবী চক্রান্ত করে, তাকে বধের দৃশ্য সকলের সামনে তুলে ধরে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে সৌদামিনী মন্তব্য করে

> "দশদিক অন্ধকার দেখিলাম একদন্ড নিশ্চিতভাবে দাঁড়াইবার স্থান নাই। কুনের ধারে একটু দাঁড়াই। তাহাও বিধাতার অসহ্য। আমি প্রতিদিন পলে পলে অনুভব করিতে লাগিলাম আপন সন্তান স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দৃঢ়তর করে। কিন্তু সপত্নী সন্তান-স-স্ত্রীকে স্বামীর হৃদয় হইতে দূর করে।"৬

'তারিণীভবন' এই সমস্ত অত্যাচারিত দুঃখী মানুষের জীবনের আশ্রয়স্থল। সৌদামিনী তার অশান্ত জীবনের দুঃখের দাহ মেটাতে পেরেছে তারিণীভবনে এসে। এখানে সে খুঁজে পেয়েছে জীবনের মানে। সৌদামিনীর মত রাফিয়া বেগমের জীবনে ঘটে গেছে, এরকমই অসহনীয় অধ্যায়। তার স্বামী প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার। বিয়ের তিন বছর পরে মাত্র দুটি কন্যা সহ স্ত্রীকে রেখে নিজে ইংল্যান্ডে চলে যায়। সেখানে দশ বছর কাটায়। পতিঅন্ত রাফিয়া বেগমের এই দীর্ঘ দশ বছর স্বামী অদর্শনে কাটে। এমনকি স্বামীর দুটি প্রিয় খাদ্য আম ও দুধের সর এই দশ বছর তিনি পরিত্যাগ করেন। অন্যদিকে রাফিয়া বেগমের স্বামী প্রথমদিকে পত্রালাপ করলেও সময়ের সাথে সাথে এই পত্রালাপ কমে আসে। দীর্ঘ অধীর আগ্রহ ও প্রতীক্ষার পরে রাফিয়ার স্বামী একটি 'সুবিস্তৃত ত্যাগপত্র পাঠায়।' আর নিজের অজান্তে রাফিয়া সই করে সে পত্র গ্রহণ করে-তাই লেখিকা এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "সুতরাং তাঁহাদের বিবাহ-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল! এই রূপে ১৩ বৎসরের বিবাহ বন্ধন কলমের এক আঁচড়ে শেষ হইয়া গেল।" ৭

তারিণীভবনের আর এক আশ্রিতা ভগিনী মিসিস হেলেন। জাতিতে তিনি খ্রিস্টান হলেও তার জীবনের কাহিনিও এদের মত করুণ। বিয়ের আগে থেকে হেলেন তার স্বামীকে চিনলেও বিয়ের পর বদলে যায় তার স্বামী। বিয়ের দ্বিতীয় বছর থেকে হেলেনের স্বামী মাদকাসক্ত এবং অন্যান্য কুক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাই সাকিনা জানায় —

> "রাত্রি ১২/১ টার পর বাড়ি আসিয়া দিদির উপর মাতলামি ঝাড়িতেন। রাগারাগি, গালাগালি,দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল। সময় সময় প্রহারও চলিত অদ্যপি ইহার সঙ্গে প্রহারের চিহ্ন আছে।" ৮

হেলেন সবরকম শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করেও তার স্বামীকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। স্বামীর খোঁজে হেলেন 'ঘটি বাটি বিক্রি করে ইংল্যান্ডে গেলে জানতে পারে, মিঃ হরেস রিভা সন্ডার্স নামে যুবতীর সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে ধরা পরেছে এবং আরও একজন লোককে হত্যা করেছে, তাই তাকে 'ক্রিমিনাল

লুনাটিক এসাইলামে' বন্দি করা হয়েছে। নারীদের লাঞ্ছনার জন্য সামাজিক রীতি-নীতি ও দেশীয় আইনও অনেকাংশে দায়ী। হেলেন প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন—

> "ফল কথা, ইংল্যান্ডের আইন হেলেনদিকে বাতুলের বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিতে পারিল না।" [৯]

হেলেনের সুখের দিন খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। আর হেলেন শত যন্ত্রণা কষ্টের মধ্যেও বেঁচে থাকায় বিশ্বাসী। তাই যন্ত্রণাকে আত্মস্থ করেই সে বেঁচে থাকে। তারিণী ভবনের আর এক ভগিনী সাকিনার জীবনের ইতিবৃত্ত আবৃত্ত ভয়াবহ। সাকিনার মাধ্যমে সেই সময় থেকে আরও প্রায় ১৫ বছর আগের মেয়েদের জীবন যন্ত্রণার রূপ ধরা পড়ে। বিয়ের সময় সাকিনার বয়স ১৫ বছর। তার বিয়ে ঠিক হয়, খুলনার একজন উদীয়মান উকিল আব্দুল গফুর খাঁর সঙ্গে। যার কিনা চরিত্র ছিল নানা দোষে দুষ্ট। চরিত্র সংশোধনের জন্য অপূর্ব সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া স্থির করা হল। কিন্তু পাত্র আব্দুলের একজন পরিচারিকা গুপ্ত ভাবে রক্ষিত ছিল। এই পরিচারিকা আব্দুলের বিয়ের সময় তাকে জানায় যে পাত্রী নিখুঁত সুন্দরী নয়। প্রচন্ড অনিহা সত্ত্বেও সাকিনার বিয়ে হয়। বিয়ের পর দিন পাত্র আব্দুল নব বধুর বিয়ের সমস্ত অলঙ্কার চুরি করে পালিয়ে যায়। সাকিনার ভাগ্যে শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর ঘটেনি। পরবর্তী সময়ে ঊষা বিবৃত করে তার জীবনের করুন ঘটনা। ঊষা নিজেই বলে—

> 'রাফিয়াদির পাষণ্ড, হেলেনদির উন্মাদ, সাকিনাদির লম্পট মাতাল কিন্তু আমারটির এ তিন গুণের এক গুণও নাই"।[১০]

ঊষার স্বামী কাপুরুষ। কোন একদিন তাদের বাড়িতে ডাকাত 'পিস্তল হস্তে' আক্রমন করে। ঊষা ও তার স্বামীর ঘরে ডাকাতরা দরজা ভেঙে প্রবেশ করে। আর তা দেখে ঊষার স্বামী জানালা টপকে ঊষাকে একাকী অবস্থায় রেখে পালিয়ে যায়। ঊষাকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু পথে পথিক দেখে ঊষাকে ফেলে ডাকাতরা পালিয়ে যায়। পথিক তিন জনে ঊষাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে গেলে, বাড়ির মহিলারাই ঊষাকে অপমান করে। জীবনের স্রোতে ভেসে ঊষা এসে পড়ে তারিণী আশ্রমে। এখানে এসে জীবনের শাপগ্রস্ত দশা কাটিয়ে সে মিসেস সেনের নারীদের কল্যাণকামী কাজে আত্মনিয়োগ করে।

পদ্মরাগ' উপন্যাসের নারী চরিত্রের মধ্যে অন্যতম চরিত্র হল সিদ্দিকা। লতিফের সাথে সিদ্দিকার বিয়ে হবে এই শর্তে 'আকদবন্ত' হয়ে যায়। তবে বিয়ে হবে তিন বছর পরে। ২২ বছর বয়সে লতিফ এম.এ. পাশ করে। লতিফের মা তার মেয়ে রশীদার ননদের সঙ্গে লতিফের বিয়ে ঠিক করে। যার নাম সিদ্দিকা। লতিফের বাবা ও দাদুর মৃত্যুর পরে তার জেষ্ঠ্য তাত হাজী হাবীর আলম জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। আর লতিফ ও তার মাও তার অধীনস্ত। হাজী হাবীর অত্যন্ত জমিদারী পিপাসু ও অর্থলিপ্সু

ছিলেন। তিনি দেখেন লতিফ ব্যারিস্টার। সুতরাং কন্যাদায়গ্রস্ত লোকেদের কাছে এটি একটি প্রলোভন। সম্পত্তির লোভে তিনি রশিদার স্বামীকে চিঠি লেখেন, যে বিয়ের আগে যেন লতিফের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়া মেয়ের ভাগের সম্পত্তি যেন লিখে দেওয়া হয়। সোলেমান এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় হাজী হাবীর চক্রান্ত করে। তিনি লতিফের অন্যত্র বিয়ে দেন অর্থের লোভে। উল্লেখ্য এ অংশে নির্দোষ থাকা সত্ত্বেও সিদ্দিকার ভাগ্যে দুর্ভোগ নেমে আসে।

বেগম রোকেয়ার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সংকীর্ণ জাতিধর্মের সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল, নারী কল্যাণ। দীর্ঘদিনের শিক্ষাহীনতা নারীকে যে অন্ধকারে আবৃত করে রেখেছে, সেই অবরোধ থেকে নারীকে মুক্ত করে আলোয় নিয়ে আসা তাঁর মূল লক্ষ্য। সেই শিক্ষা তিনি দিতে পেরেছিলেন, মিসেস সেনের মাধ্যমে তারিণী বিদ্যালয়ে মেয়েদের। এই শিক্ষার আলোকেই পুরুষশাসিত সমাজের চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে মেয়েদের মনে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। ধীরে ধীরে মেয়েরা বুঝতে পারে, কেবল স্বামী সর্বস্বতাই জীবনের সার হতে পারে না। তারিণী ভবনে আশ্রিতা প্রতিটি ভগিনীর জীবন কোন না কোন ভাবে অত্যাচারিত। তাই সিদ্দিকা প্রশ্ন তুলেছে—

> সমাজের এই সব নালিঘায়ের কি ঔষধ নাই? বাতুলে সহিত চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে হইবে, বিনা কারণে কী পরিত্যক্তা হইতে হইবে, অপমানিতা হইয়া মাতালের সহিত সপত্নী সমভিব্যাহারে ঘর করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে সহোদর ভাই হাত বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইতে চাহিবেন, স্বামী বাতায়ণ উলঙ্ঘনে পলায়ণ করিলেন বলিয়া স্ত্রীকে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইবে— ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই?[১১]
>
> আছে, সে প্রতিকার এই তারিণীভবনের নারীক্লেশ নিবারণী সমিতি "এস যত পরিত্যক্তা কাঙ্গালিনী উপেক্ষিতা অসহায়া, লাঞ্ছিতা-সকলে এস। তারপর সমাজের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ঘোষণা। আর তারিনীভবন আমাদের কেল্লা'।[১২]

সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার এই যে প্রয়াস, এই প্রয়াসের মাধ্যমেই তারিণী ভবনের মেয়েদের চিনে নেওয়া যায়। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র সিদ্দিকা। সিদ্দিকার আসল নাম জয়নব। জয়নব জমিদার পরিবারের কন্যা। জয়নবের বড় ভাই তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং ছোটবেলা থেকে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। জয়নব থেকে সিদ্দিকা হওয়াটা সিদ্দিকার নিজের কাছেই এক লড়াই। প্রথমত ভাবী স্বামীর পরিবারের কাছ থেকে সিদ্দিকা এক অসম্মানজনক আচরণ পেয়েছে। কেবলমাত্র সম্পত্তির লোভে তার স্বামীর পিতৃব্য সিদ্দিকার সাথে লতীফ আলমাসের বিবাহ স্থির করে। একথা জানতে পেরে সিদ্দিকা ও তার দাদা চূড়ান্ত অপমানিত বোধ করেন। এরপরই শুরু হয় জয়নবের আত্মপ্রস্তুতি। জয়নবের দাদা চেয়েছিলেন, তার বোনের স্বাবলম্বীতা, তাই তিনি নিজে জয়নবকে জমিদারীর সমস্ত কাজ শিখিয়ে ছিলেন।

প্রজাপালন সংক্রান্ত জমিদারীর সমস্ত কাজ শিখিয়ে জয়নবকে তার নিজের সম্পত্তি তার দাদা বুঝিয়ে দেন।

সিদ্দিকার জীবনের ঘটনার মাধ্যমে আমরা সেই সময়ের পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কেও অবগত হতে পারি। নীলকর ইংরেজ সাহেবদের অত্যাচারের বিবরণ লেখিকা এখানে দিয়েছেন। সিদ্দিকার বড় ভাই সোলেমান জমিদার ছিলেন। তিনি নীলচাষে সম্মত ছিলেন না, তাই নীলকর সাহেব রবিনসন তাকে হত্যা করে। সোলেমানের পুত্র এর প্রতিবাদ করলেও তাকে হত্যা করে রবিনসন। এর পরে ওই ঘটনার তদন্ত শুরু হলে, রবিনসন চেষ্টা করে জয়নবকে আসামী সাজাতে। ব্যারিষ্টার লতিফ আলমাসের সহায়তায়। যদিও লতিফ চেয়েছিল, গোপনে জয়নবকে সাহায্য করতে। আর জয়নব এই অনাচারের প্রতিবাদে নিজের জীবন আত্মাহুতি দিতে চেয়েছিল। লতিফের কথায় ও দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

> "সে অতি ভয়ংকর দৃশ্য! দেখি কি সেই কাপড়গুলির চতুর্দিকে আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে আর বীরবালা জয়নব সেই অনলের মাঝখানে অটলভাবে দাঁড়াইয়া।[১৩]

এরপর জয়নব একাকী পালিয়ে চলে আসে কলকাতায়। বেগম রোকেয়া তাঁর 'পদ্মরাগ' উপন্যাসের গোটা উপন্যাস জুড়েই একটা রহস্যময়তা বা সাসপেন্সের আবরণ বজায় রেখেছেন। উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায়, নৈহাটী ষ্টেশনে একজন মানুষ অপেক্ষারত। ওই অপেক্ষারত মানুষটিই আসলে সিদ্দিকা। পুরুষের ছদ্মবেশ ধরে সে ষ্টেশনে আসে। অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো তারিণী ভবনের মহিলাদের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে জানায়, তার ভগিনীকে আশ্রয় দেওয়ার কথা। এরপর একাই ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমে সে জানায় যে তার ভাই তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে। তারিণীভবনের কোন ভগিনীই জানতে পারেনি, সিদ্দিকার আসল পরিচয়। অন্যদিকে সিদ্দিকার স্বামী লতিফ আলমাস অসুস্থ হয়ে তারিণী ভবনেই আশ্রয় নেয়। আবার অত্যাচারী নীলকর সাহেব রবিনসনও ঘটনাচক্রে সিদ্দিকার কাছে এসে পড়েন। সিদ্দিকাই তার শুশ্রষার দায়িত্ব নেয়। জীবনের শেষ মূহুর্তে রবিনসন তার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন, সিদ্দিকার কাছে। এভাবেই বেগম রোকেয়া তাঁর উপন্যাসে ঘটনার বুননকে পরিণত করে তুলেছেন।

'পদ্মরাগ' উপন্যাসে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে, নারীদের লাঞ্ছনা ও অপমানের কথা। ঊষার বক্তব্যে প্রকাশিত হয় আরও এক জীবন্ত সত্য। নারীর জীবন প্রায় সবসময়েই কষ্টকর। এ প্রসঙ্গে ঊষা বলে—

> "রমনী শৈশব হইতে আত্মত্যাগ শিক্ষা করে। কুমারী জীবনে পিতা ও ভ্রাতার জন্য স্বার্থত্যাগ করে। বিবাহিত জীবনে স্বামীর জন্য এবং শেষে সন্তানের জন্য আত্মত্যাগ করে। কাহারও আত্মত্যাগ কেবল গৃহ জীবনে সীমাবদ্ধ থাকে-কাহারও আত্মত্যাগ সংসারময় ব্যপ্ত হয়।[১৪]

আলোচ্য 'পদ্মরাগ' উপন্যাস উক্ত মন্তব্যে সার্থকতা মন্ডিত হয়েছে। তারিণীভবন এবং নারী ক্লেশ নিবারণী সমিতি নারীদের সমস্যাকে তুলে ধরে, তা থেকে নিরসনের পথ অনুসরণ করে দেয়। একসময় নারীদের মুক্তির পথ মেলে এখানে। কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থা, সেই বিষয়কে ভালোভাবে মেনে নেয় না। তারিণী ভবন সম্পর্কে অনেকেই সমালোচনা করেন। আসলে এর সমাজ হিতকর দিকগুলি সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে ওঠে।

তবে চিরাচরিত পুরুষ শাসিত সমাজের প্রথাগুলির প্রতি সিদ্দিকা এক তীব্র প্রতিবাদ জানায়। পরার্থে এবং ভবিষ্যৎ নারীর জন্য সে নিজের জীবনের সংকীর্ণ সুখ পরিত্যাগ করে। এই জয়নব অর্থাৎ সিদ্দিকার মাধ্যমেই বেগম রোকেয়া গড়ে তুলতে চেয়েছেন, স্বয়ং সম্পূর্ণা আদর্শ এক নারী। তাই কল্পিত রোমান্টিকতা ত্যাগ করে তিনি বাস্তবের সংস্পর্শেই জয়নবকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করে তুলেছেন।

তথসূত্র ঃ

১। পদ্মরাগ, বেগম রোকেয়া, বেগম রোকেয়া রচনাবলী, সম্পাঃ মোস্তফা মীর, তৃতীয় মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, বর্ণায়ন, ঢাকা-১১০০, পৃ. ৩৫৬।
২। পদ্মরাগ, বেগম রোকেয়া, বেগম রোকেয়া রচনাবলী, প্রস্তাবনা, অংশ, সম্পাঃ মোস্তফা মীর, প্রাগুক্ত, পৃ ৮।
৩। ঐ, পৃ-২৬৮
৪। ঐ, পূ-২৯৫
৫। ঐ, পৃ-২৯৫
৬। ঐ, পৃ-২৯৮
৭। ঐ, পৃ-৩০৭
৮। ঐ, পৃ-৩০৮
৯। ঐ, পৃ-৩০৮
১০। ঐ, পৃ-৩১১
১১। ঐ, পৃ-৩১৩
১২। ঐ, পৃ-৩১৩
১৩। ঐ, পৃ-৩২০
১৪। ঐ, পৃ-৩২২

কা লি দা স ভ দ্র

তোমার পা

গাব ভেরেন্ডা গাছে বৃষ্টির গুন গুন
তুমি দাঁড়িয়ে আছো স্কুল গেটে

এই মাত্র ছুটির ঘন্টা বাজলো
এখুনি আসবে নীল বাস

খালের পাড়ে বোল্ডারের উপর দাঁড়িয়ে
দেখছি তোমার পা দাঁড়িয়েছে ঘুরে
খঞ্জনী বাজিয়ে গেলে আষাঢ়-বোষ্টুমী
নোয়াই খালের জল
ডাক দেয়, রাধা, রাধা...

তোমার পা অমনি যমুনায় ছলাৎছল

প্র ভা ত কু মা র মু খো পা ধ্যা য়

দীপালি ও নিম্নচাপ

কুমারী কদম্বের হলুদ পেটেন্ট নিয়েছিল সেইবার যতুকাকুর ঠাকুর
আগলে রেখেছিল সেই হেমবর্ণ প্রভা ধনেখালির মৃন্ময় কোঁচড়ে...
কটিদেশে-জঘনে-স্তনে
ধূসরপীতাভ হয়েছে কি ওই বর্ণমালা... বয়স-পাথরের ভারে
কঠিন আস্তরণে?
সেই নরুণপেড়ে সুখ
সেই তেইশতম বসন্তের উষ্ণ হলুদ
ড্রেসিং টেবিলের সেই নিরালা নির্জনতা, লিপগ্লস, আই-লাইনারের একান্ত মুহূর্ত
অতি ক্ষিপ্রতায় পেখম গুটিয়ে অপাঙ্গে টাঙ্গানো সে আহ্লাদী স্নিগ্ধতা
শিকড়ে শিকড়ে চারানো আকাশ বাইতে চাওয়া সেই বায়ুর ফিসফিস

প্যান্ডেলে যাব কী ছাই, অ-ঘ্রাণ টারমিনাসে...যা বৃষ্টি নেমেছে!

বছর কয়েক হল, লিভিং রুমে বন্দী থাকতে চায় না আর বেপাত্তা স্বপ্নেরা।
ছো: লোলচর্ম বৃদ্ধের মতন হয়ে পড়েছে নাকি নিরালা নগ্নতা,
ভুলে গেছে যৌবধর্মের গান। ইস!

ম্যাডোনা কি খালি গলায় কখনও আর গাইবে ক্ল্যাসিক্যাল?

তাজিমুর রহমান

সাজঘর

দহনেরও একটা নিজস্ব বাতিঘর থাকে, যেখানে
অনন্ত জ্বেলে রাখি দীপ,সভ্যতার
আর আকাশ থেকে হঠাৎ নেমে আসা মেঘের মাদলে
ভাসিয়ে দিই সকল বহ্নিশিখা
যদি ফিরিয়ে দেয় কখনও শীতার্ত ছাই ও শুভেচ্ছা বার্তা

একা সিদ্ধার্থ পেতে রয়েছে হাত। কপিলাবস্তুও অপেক্ষায়!
একটু পরেই পায়েসান্ন থেকে ছড়িয়ে পড়বে
শ্রমণগাথা ও গীতবিতানের বিনীত অক্ষরসকল,
শান্ত পরিভ্রমণ সেরে তখন একাকি সুজাতা

মাত্রাবৃত্তে পার হয়ে যাবে শোণিত রাজপথ, দয়িতাপ্রণয়
মৃদু আলোয় যেটুকু উদ্ভাস এরপর বুটিক হয়ে জেগে থাকে
আমাদের যৌবন দরজায়
তার ভেতরে সযত্নে গড়ে নেবো পোড়াকাঠের সাজঘর

নির্মল করণ-এর দুটি লিমেরিক

জিজ্ঞাসা

রাবণ রাজার বাড়তি নাকি মাথা ছিল নয়টা
হিষেব কষে বলতো দেখি চক্ষু ছিল কয়টা?
বয়সকালে বদ্যি এলো
ক্ষীণদৃষ্টি যাচাই হলো
বলতে পারিস চশমাতে তার ডান্ডি লাগল কয়টা?

বিজ্ঞাপন

দেশ ছেয়েছে বিজ্ঞাপনে কোথাও নেই ফাঁকা
ট্রেনে-বাসে ছাতায়-পাতায় সব কিছুতেই আঁকা
ডিম্ব-পৃষ্ঠ বাদ যাবে না
ট্যাটু আঁকা আর হবে না
দেখবে এবার মানব শরীর বিজ্ঞাপনেই ঢাকা।

সু লে খা স র কা র

সমর্পণ

নিস্তব্ধ হতে হতে গাছ হয়ে গেছি।
আমাকে ছুঁয়ে গেছে যে নদীটি
তার উৎসস্থল আমি নিজেই।
আমি নিজেই দমবন্ধ উচ্চারণে পাখিদের ডাকি,
ওরা শ্লোক পাঠে স্থিতি দেয়। ধ্যান দেয়।
জেগে উঠি বর্ণচ্ছটায়।
একটি বক্ররেখা আমার গভীরে
ও রেখায় পথ ভুলে আসা পাতিহাঁস
সৌভাগ্য খুঁজে নিতে নিতে শব্দ হারায়।
এখানে ঠিকানা খোঁজার কোনো সাইনবোর্ড নেই,
আনাচকানাচে কোনো তৃপ্তি নেই স্বাধীনতার।
ঈশ্বর, অস্ত্র দাও। আয়ু দাও।
আমি নির্বিঘ্নে সমর্পণ খুলে রাখি ধর্মগ্রন্থে।